Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়নের পার্থক্য

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা মামুনুর রশিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –
আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

সুলতানা লুনা
২১৬০২০৮৩৩

তারিখঃ ২ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়নের পার্থক্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

জমা দিয়েছেনঃ

সুলতানা লুনা
২১৬০২০৮৩৩

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –
আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়নের পার্থক্য" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুলতানা লুনা-২১৬০২০৮৩৩ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মামুনুর রশিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “বাংলাদেশের মক্তব ব্যবস্থা এবং সমস্যা দূরীকরণে করণীয়” শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জিঃ খন্দকার মারসুস উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

Sultana
Luna

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ
২ জুন, ২০২৪ ইং

সুলতানা লুনা
আইডিঃ ২১৬০২০৮৩৩
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

<u>**সূচিপত্র**</u>

লেখকের কথা

সকল প্রসংশা আল্লাহর যিনি ১৮ বছর বয়সে আমার মতন পথভ্রষ্ট নারীকে হেদায়েতের দাড় খুলে দিয়েছিলেন। আর সেই দাড়ের আর একটু কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আই ও এম থেকে ২০২১ সালের ২১৬ ব্যাচে, **ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ** এ পড়ার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

একজন মুসলিম নারী হিসেবে নিজের সম্মান ও ইমানকে আরও মজবুত করতে শান্তির ধর্ম ইসলাম ঠিক কিভাবে আমাদের মূল্যায়ন করেছে তা জানার আগ্রহ থেকেই আমি গবেষণার এই বিষয়টি বাছাই করেছি। আল্লাহ তা'আলা কুরানের সুরা আল ইমরানের ৬৪ নাম্বার আয়াতে বলেছেন "এসো সেই কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক"।

প্রত্যেকটি মুসলমানকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন আহলে কিতাব বা অমুসলিমদের সাথে শুধু মাত্র সাদৃশ্য গুলো নিয়েই আলোচনা করতে। আমরা যখন কারো সাথে অমিল নিয়ে আলোচনা করি তখন আমাদের মধ্যে সবাভাবিক ভাবেই বিরোধ বাধে। অশান্তির সৃস্টি হয় । আর আল্লাহ পাক কুরানের অনেক জায়গায় বলেছেন তিনি অশান্তি পছন্দ করেন না। আমার গবেষণায় আমি কোনভাবেই অন্য ধর্মকে কটাক্ষ ইঙ্গিত করিনি যেহেতু আমার বিষয়টাই মূল্যায়নের পার্থক্য তাই আমি শুধু মাত্র কালক্রমে ধর্মভেদে নারীর মূল্যায়নের পার্থক্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

রিসার্চ করতে গিয়ে আমি অনেকগুলো গুগলসাইট এবং বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তবে চেষ্টা করেছি অথেনটিক দলিলগুলোকে সামনে রেখেই একেবারে নিজের ভাষায় লিখতে। এর পরেও হইতো লেখায় অনেক ভুল থাকতে পারে এর জন্য ভুলগুলোকে ইখতিলাফ ভেবে শুধু মাত্র আমার রিসার্চের আসল উদ্দেশ্যকে যেন নিজের জীবনে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, আল্লাহ্ এর তৌফিক দান করুন। আমিন...

ভুমিকা

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

O mankind, fear you’re Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allāh, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allāh is ever, over you, an Observer.

[An-Nisa: Ayat 1]

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সূরা আন নিসাঃ আয়াত ১]

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টযে পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রত্যেক মানবজাতিকে আল্লাহ্ একজন নরনারী থেকেই সৃষ্টি করেছেন, এর পর একে একে আকার আকৃতি, জাত, ধর্ম, বর্ণ, কর্ম সব কিছুতে মানুষ ভাগ হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনে আস্তে আস্তে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও মানব সৃষ্টি হিন্দু ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম এবং হিন্দু উভয় ধর্মেই নারীকে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিম্নে নারীর মূল্যায়নে উভয় ধর্মের পার্থক্যগুলো এক একটি ধাপে প্রতিফলিত হয়েছে।

মানব সৃষ্টির শুরুতে প্রথম নারী ছিলেন হজরত হাওয়া আলাইহিস সালাম। আদম (আঃ) এর অর্ধাঙ্গিনী। আদম আলাইহিস সালাম একাকিত্ব থেকে দূর করতে এবং মানব সমাজের সূচনার তাগিদে আল্লাহ তা’আলা হজরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছিলেন।

আল্লাহ নারীদের সৃষ্টির উদ্দেশে আরও বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

And one of His signs is that He created for you spouses from among yourselves so that you may find comfort in them. And He has placed between you compassion and mercy. Surely in this are signs for people who reflect.

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। [সূরা আর-রূমঃ আয়াত ২১]

অর্থাৎ নিশ্চয় নারীদের সৃষ্টির পিছনে আল্লাহুর মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।

ইসলাম বনাম হিন্দু ধর্মে নারীদের মূল্যায়নের পার্থক্য

নারীর মর্যাদা বলতে নারীর মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান ও ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর এ অধিকার একজন নারীর প্রাপ্য। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়।

সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত

না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।' [বাক্কারাহ ১৮৭]

হিন্দু ধর্মানুসারে নারীদেরকে বলী দেওয়া হত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body.' অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

যেহেতু ধর্মের রীতিনীতি, বিশ্বাসেও ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে আলাদা তাই নারীদের মূল্যায়নের পার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

দুটি ধর্মের মধ্যে মূল্যায়নের পার্থক্য গুলো প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে তুলে ধরা হল।

ইসলামের পূর্বে নারীর অবস্থান

ইসলামের পূর্বের যুগে নারীরা ছিল সবচেয়ে নির্যাতিত লাঞ্ছিত অবহেলিত এমনকি ভোগ বিলাসের উপকরণ।নারীদের সামাজিক অধিকার বলে কিছুই ছিলনা। নারীরা কোন সময়ে তাদের যোগ্য মর্যাদা পায়নি।সে সময় নারীরা শুধু পুরুষের ভোগবিলাস ও বাণিজ্যের পণ্য ছিল। নারীদের প্রতি কঠোর আচরণ করা হত।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলিরা কন্যা সন্তানের জন্মকে অভিশাপ মনে করে নিষ্পাপ সন্তানদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখতে তাদের একটুও বুক কাঁপত না।তাদের এমন জঘন্য কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন,

'And when the girl buried alive is asked- For what sin she was killed?'

'যখন জীবন্ত দাফনকৃত কন্যাসন্তানকে জিজ্ঞেসা করা হবে-

কন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' [সূরা তাকভিরঃ আয়াত ৮, ৯]

সে সময় পুরুষেরা যত ইচ্ছা বিয়ে করত, এমনকি ভোগ বিলাসের পর নিজের স্ত্রীদের বাজারের পণ্যের ন্যায় বিক্রি করে দিত।উপহার হিসেবে নিজের স্ত্রীকে দান করে দিত আবার কখনো স্ত্রীকে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করত।স্ত্রীর সামনেই দাসীদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত থাকত কিংবা নিজের স্ত্রীর সাথে দাসী সুলভ আচরণ করত।

পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় হত্যাকারী পুরুষের বদলে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। গ্রিক সভ্যতায় তাদের পৌরাণিক গল্পের নারী চরিত্র প্যান্ডোরাকে সমাজের সব দুঃখ-কষ্টের উৎস মনে করা হতো। আবার রোমানরাও কোনো অংশে কম ছিল না, মন চাইলেই তারা নারীদের হত্যা করে ফেলত। মিসরীয় সভ্যতায় নারী ছিল শয়তানের প্রতীক। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের সতীদাহ প্রথা আর আরবে কন্যাশিশুদের জীবন্ত প্রোথিত করা তো ছিল অতি প্রচলিত সামাজিক

রীতি। কন্যা সন্তান হলে অপছন্দ করা, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করা, ইসলামপূর্ব বর্বর জাহেলি যুগের কুপ্রথা ছিল। সভ্যতার দাবিদার ইংল্যান্ডে ডাইনি বলে নারীকে পুড়িয়ে মারা হত। বিয়ের আগেও যদি কোনো নারী চাকরি বা অন্য কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করত তাহলে তার বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত তার স্বামী।

মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে শিশুদের হত্যা করতে নিষেধের নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'আর তোমরা তোমাদের সন্তান্দেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে ও আমিই রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ [সুরা বনি ইসরাইলঃ]

জাহেলিয়াত যুগের কেউ যদি কন্যা জন্মলাভ করত, তাহলে তারা কন্যা হওয়াকে নিজের জন্য অমঙ্গল ও অপমানের কারণ মনে করত। সন্তান জন্মের কিছুদিন পূর্ব থেকেই তারা মানুষের আড়াল হয়ে যেত, মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াতো যে, জানা নেই আমার ঘরে কী সন্তান জন্মলাভ করবে। পরে যদি ছেলে সন্তান হতো এটাকে তার জন্য সম্মানের বিষয় মনে করত। আর যদি মেয়ে সন্তান হত তাহলে তারা সেটাকে অমঙ্গল ও অপমানের কারণ মনে করত।

মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

'নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত কোনো প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি। [সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১৪০]

এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, "সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন,

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা"। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

"ইসলামের ইতিহাস" গ্রন্থে গ্রন্থকার উল্লেখ আছে যে, "বনী তামীম এবং কোরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এজন্যে রীতিমত গর্ববোধ করতো এবং তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। কোন কোন পরিবারে এ পাষণ্ডতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেতো এবং মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো, তখন পাঁচ ছ' বছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতো। পাষণ্ড পিতারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুড়ে আসত এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চীৎকার করে করে বাপের কাছে সাহায্য চাইতো, কিন্তু পাষণ্ড পিতা তার দিকে বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তাকে হত্যা করতো বা জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসতো এবং আপন কলিজার টুকরা সন্তানকে জীবন্ত প্রেথিত করার জন্য সে রীতিমত গর্ববোধ করতো।

বনী তামীমের জৈনেক কায়স ইবন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রেথিত করে।হাদীস শরীফে এক ব্যক্তির একটি আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জাহেলী যুগের ঘটনা শুনিয়েছেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। সে দিনে দিনে বড় হতে থাকে। কিন্তু তার জীবিত থাকার বিষয়টি আমার সহ্য হচ্ছিল না। আমি একদিন তাকে তার মায়ের কাছ থেকে কোনো এক বাহানায় নিয়ে গেলাম। আমি তাকে বললাম, চলো একটু ঘুড়ে আসি। পরে আমি তাকে এক খোলা প্রান্তরে নিয়ে গেলাম। সেখানে পূর্বেই আমি একটা গর্ত করে রেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি তাকে বললাম, আমি এ কূপটি খনন করব যেন পানি পাওয়া যায়। আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি বালতিতে মাটি ভরে দিবে আর

আমি তা উপরে তুলে নিব। আমার মেয়ে আমার কথা মেনে নিল। সে নিচে নেমে গেল। কিন্তু যখনই সে নিচে নামল আমি তার উপর মাটি দিতে শুরু করলাম। মেয়েটি আমাকে বলল, আব্বা! আপনি কী করছেন? আমার উপর মাটি দিচ্ছেন! কিন্তু আমি এতটাই কঠিন দিলের ছিলাম যে, তার কথায় আমার কোনো আছর হল না। আমি মাটি দিতেই থাকলাম। প্রথমে মাটি তার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে নিল। পরে পেট, এরপর বুক, তারপর ঘাড়, অবশেষে মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিল। এমনকি মাটি যমিনের সমান হয়ে গেল। আমার মেয়েটি চিৎকার করছিল, আমাকে ডাকছিল। এক সময় তার চিৎকার ও ডাকাডাকি শেষ হয়ে গেল। আমি তাকে এভাবে জীবিত দাফন করে ফিরে এলাম। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা শুনিয়েছি তখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, এ কেমন পাষণ্ড [আলওয়াফী বিলওয়াফায়াত ২৪/২১৫, কায়েস ইবনে আছেম ইবনে সিনান ইবনে খালেদ এর জীবনী দ্রষ্টব্য] ইসলাম এই জুলুম-প্রথার অবসান ঘটিয়েছে।

জাহিলিয়ের যুগে নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার টুকুও হরণ করা হত।তারা অত্যন্ত অমানবিক আচরণ পেয়েছে।ছিলনা নারীদের কোন সম্মান, ছিলনা সমাজে তাদের কোন স্বীকৃতি এমনকি বাবার অংশীদার হিসেবে কোন সম্পত্তিও পেতনা ।

আরব ছিলো একসময় অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার আর নানা অনাচারে ঘেরা এক মরু উপত্যকা।যুগের পর যুগ নারী কেবল ভোগ্যপণ্যের মতো জীবনযাপন করেছে, কোনো সমাজই তাকে তার প্রাপ্য সম্মান বুঝিয়ে দেয়নি।

ইসলামের আগমনের পর নারীর অবস্থান

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাতে নারীদের সর্বোচ্চ মর্যাদা নিশ্চয়তা দেয়, যাদের সম্পত্তির ভাগ দেওয়া হয়েছে, নারীর সম্মান রক্ষা ও পূর্ণ অধিকার দেওয়ার দায়িত্ব পুরুষ দের উপর দিয়েছে। নারীদের কে বাহিরে ঝুঁকি পূর্ণ কাজ থেকে রেহাই দেওয়ার কথা এবং একজন পুরুষ কে একজন নারীর ভরন পোষণ ও পূর্ণ দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছে। বিবাহিত স্ত্রী কে মোহরানা পরিশোধ না করে স্পর্শ করতে মানা করেছেন। মোহরানা বকেয়া রেখে কোন স্বামী মারা গেলে তার কোন পাপ না থাকলেও স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ নেই।

ইসলাম নারীর মর্যাদার নিশ্চয়তা দেয়। বিবি খাদিজা (রা.) ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শহীদ সুমাইয়া (রা.)।

যখন কন্যা শিশু ও নারীদের সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না, তখন ইসলাম কন্যা শিশু ও নারীকে দিয়েছিল পৃথিবীর সেরা মর্যাদা। তাদের অধিকার রক্ষায় ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। কোরআন সুন্নায় কন্যা শিশুর প্রতি সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম আচরণের জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।কন্যা সন্তানের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করলেই হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী তার জন্য জাহান্নাম হারাম। মিলবে সুনিশ্চিত জান্নাত। সর্বোচ্চ বোনাস হিসেবে থাকবে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ।

ওমর (রা.) হতে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইবনু আছিম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি জাহিলিয়াতের যুগে আমার ৮ জন কন্যাকে জীবিত প্রোথিত করেছি, এখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও। তখন কায়েস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি তো উটের মালিক। আমি গোলামের মালিক নই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেকের জন্য একটি

করে উট আল্লাহর নামে কুরবানী করে দাও। [বাযযার, তাবারানী, ইবনু কাছীর হা/৭১৭১)]

ইসলাম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, সমাজ-সংসারে তাদের সম্মানিত করেছে। ইসলাম সব সময় নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশ হলো,তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।` (সুরা নিসা: আয়াত ১৯)

ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীরা বিভিন্ন অবিচার ও বৈষম্যের শিকার ছিল। কিন্তু ইসলাম স্বামীহারা নারীদের মানবিক সম্মান ও অধিকার দিয়েছে।

শরিয়ত নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে।

ইসলামে নারীর মূল্যায়নের ধাপ সমূহ

ইসলাম ধর্মের সূচনার পূর্বে নারীদের এতো করুণ অবস্থা ছিলযে, নারীদের জন্ম সমাজের মানুষ অভিশাপ বলে মনে করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর নারীদের মূল্যায়ন পরিপূর্ণভাবে প্রশার ঘটেছে। নারীদের অধিকার বিষয়ে মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম সরব হয়েছে ইসলাম। ইসলাম মা হিসেবে, বোন হিসেবে, নিকটাত্মীয় হিসেবে এবং স্ত্রী হিসেবে দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অধিকার। ইসলামে নারীর মূল্যায়নের কথা বলতে গেলে কয়েকটি বিশেষ ধাপ চলে আসে।

সেই ধাপগুল হলঃ

- আল্লাহ্‌র কাছে নারীর মর্যাদা
- রাসুল (সাঃ) নিকট নারীর মূল্যায়ন
- ইসলামের পূর্বে নারীর অবস্থান
- ইসলামের আগমনের পর নারীর অবস্থান
- মা হিসেবে ইসলামে নারীর মর্যাদা
- মেয়ে হিসেবে নারীর মূল্যায়ন
- একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা
- স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান
- শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার
- কর্মজীবন বা কর্মস্থানে নারীর মুল্য
- বিধবা নারীর মর্যাদায় ইসলাম
- সম্পত্তির অধিকার
- ইসলাম ধর্মে ঋতুবতী নারীর অবস্থান
- ইসলামে নারীর নিরাপত্তা

আল্লাহ্‌র কাছে নারীর মর্যাদা

নর-নারীর সমন্বয়ে আল্লাহ্‌ মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন। আর সেই সৃষ্টির অন্যতম নেওয়ামত হল নারী।আল্লাহুর সৃষ্টি জগতের যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর সেখানে নারীরা আছে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে। নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষ্যায় আল্লাহ্‌ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন, সূরাটি হল আন-নিসা বা নারী। সুরা বাকারা, আল ইমরান, মায়েদা, আহজাব, নুর ইত্যাদিতে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে।

নারীদেরকে আল্লাহ্ প্রত্যেক পর্যায়ে মূল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ নারী পুরুষের মধ্যে মূল্যায়নের পার্থক্য করেননি বরং নারীদের হক আদায়ে পুরুষকে সতর্ক করেছেন।এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

'হে ঈমানদারগন! জোর করে নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদের যা দিয়েছো তার কিছু অংশ নিয়ে যাওার জন্য তাদের আটকে রেখো না, তবে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতা করলে ভিন্ন কথা। তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় বসবাস কর। কিন্তু যদি অপছন্দ করো তাহলে তোমরা যা অপছন্দ করো আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।' [সূরা নিসাঃ আয়াত ১৯]

মহান আল্লাহ্ ধন সম্পদ, বর্ণ, মর্যাদা, ক্ষমতার, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ভেদে কোন নারীর পার্থক্য করেনি, বরং একজন নারীকে তার ঈমানের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছেন। এমনকি একজন পুরুষকেও উত্তম স্ত্রী হিসেবে ঈমানদার নারী বাছায় করতে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৫নাম্বের আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

'তোমাদের মধ্যে যাদের ঈমানদার স্বাধীনা নারীদেরকে বীয়ে করার সামর্থ্য নেই, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসীকে বিয়ে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে ভাল জানেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভূত।'

নারীদের অধিকারে আল্লাহ্ আরও বলেছেন সূরা বাকারার ২২৮ আয়াতে

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।'

নারী ও পুরুষের প্রতি সমান নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং

তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।’ [সূরা বনী-ইসরাঈলঃ আয়াত ৭০]

আল্লাহ তা’আলা নারী পুরুষ উভয়কেই পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

‘মুমিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত।‘[সূরা আন-নূরঃআয়াত ৩০]

‘Tell the believing men to reduce [some] of their vision and guard their private parts. That is purer for them. Indeed, Allah is acquainted with what they do.’

‘আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।‘

[সূরা আন-নূরঃআয়াত ৩১]

And tell the believing women to reduce [some] of their vision and guard their private parts and not expose their adornment except that which [necessarily] appears thereof and to wrap [a portion of] their headcovers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands' fathers, their

sons, their husbands' sons, their brothers, their brothers' sons, their sisters' sons, their women, that which their right hands possess, or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment. And turn to Allah in repentance, all of you, O believers that you might succeed.

যেখানে অনেকগুলো কাজের ফলস্বরূপ একজন পুরুষের জান্নাত সেখানে মাত্র ৪টি কাজের বিনিময়ে একজন নারী জান্নাতি হতে পারেন। রাসুল(সাঃ) বলেছেন কোন মহিলা যদি এই ৪ টি কাজ ঠিক মতন করেন তাকে বলা হবে জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।আর সেগুল হলঃ

১) ৫ ওয়াক্ত নামায

২) রোজা

৩) স্বামীর আনুগত্য

৪) লজ্জাস্থানের হেফাজত।

আল্লাহ্‌ বলেছেন,

‘নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।‘

[সূরাঃ আল-আহযাবঃ আয়াত ৩৫]

আল্লাহ্ বলেছেন,

‘হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।‘

[সূরা আল-মুমতাহিনাঃ আয়াত ১২]

আল্লাহ্ নারীকে যেমন কোমল মমতাময়ী গুণে সৃষ্টি করেছেন তেমনি নানা দিক থেকে নারীকে ক্ষমতাবান করেছেএ, নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয় প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব। সর্বোপরি নারীকে পালন করতে হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের গুরুভার। আল্লাহ্ নারীদেরকে যেসকল অধিকার দিয়েছেন সেসব অধিকার সমাজে বাস্তবায়িত হলে এক একটি পরিবার হয়ে উঠবে এক টুকরো জান্নাত।

রাসুল (সাঃ) নিকট নারীর মূল্যায়ন

তবে নারীর প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ, সাধারণ আরবদের মধ্যে নারী নির্যাতনের রেওয়াজ ছিল।

মহানবী (সা.) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, 'নারীরা আল্লাহ তাআলার দাসী, তোমাদের নয়। তাদের কখনোই মারধর করবে না।' [আবু দাউদ]

মহানবী (সা.) সব সময় মানুষের উপর মানুষের অধিকার বিশেষকরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারের বিষয়টিও সুস্পষ্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাসুল (সাঃ) নারী সম্মান, মর্যাদা ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।আল্লাহুর রাসুলের (সাঃ) উসিলায় অনেক নারী সাহাবী শিক্ষিত হতে পেরেছেন। যেসকল মহিলা সাহাবী কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন আরওয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, সুদা বিনতে কোরায়য, রসুল (সা.) এর দুধবোন শায়মা, আতেকা বিনতে যায়দ, হযরত খানসা প্রমুখ। হযরত খানসা (রাঃ) এর কবিতা রাসুল (সাঃ) অত্যন্ত আগ্রহ ভরে শ্রবণ করতেন এবং বলতেন, হে খানসা, আরো কিছু শোনাও।

মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করতেন। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহা নবী (সা :) বলেছেন উত্তম সঙ্গী সৌভাগ্যের পরিচয়ক। (মুসলিম শরিফ)

হাদিসে আরও উল্লেখ রয়েছে, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, কিংবা তাকে মারধর করে, তার সম্পর্কে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সৎ বলে বিবেচিত হবে না। [আবু দাউদ]

হজরত রাসুলুল্লাহ (সা:) সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা, মানবিক কারণ, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে তৎকালীন আরবের কুসংস্কার উচ্ছেদ করার জন্য রাসুল (সা.) নবুয়াত লাভের আগেই বিধবা নারী বিয়ে করেছিলেন। খাদিজা (রা.) রাসুল (সা.)-কে আগলে রেখেছিলেন আর্থিক ও মানসিকভাবে। প্রথম ঈমান এনে পাশে থেকেছেন নবুওয়াতের সূচনা থেকেই। রাসুল (সা.) নির্ভার আর নিশ্চিন্ত ছিলেন খাদিজার ভালোবাসার সান্নিধ্যে।

নবীজি (সাঃ) এর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অসহায়, এতিম ও বিধবাদের সেবা করতেন। রাসুলের (সাঃ) চাচা আবু তালেব মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি শুভ্র, তার চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো, তিনি এতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক।‘ [সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০০৮]

সমাজে নারীর ভূমিকা অনন্য। নারীই পরিবার ও সমাজের ভিত রচনা করে দেয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম নারীর কাছ থেকেই মৌলিক শিক্ষা লাভ করে। পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা এবং মহানবী (সা.)-এর সমগ্র জীবনাচরণ অনুসরণের মাধ্যমেই নারীর জীবন হতে পারে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। ভারসাম্যপূর্ণ সুখী পার্থিব জীবন এবং সাফল্যমণ্ডিত পরকালীন জীবনের জন্য প্রকৃত ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা গ্রহণে নারী হোক সদা আত্মপ্রত্যয়ী।

রাসুল (সাঃ) নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় যুদ্ধ করেছিলেন।আবু আওন থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে এক ইহুদি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদি তাঁর মুখের নেকাব খোলানোর অপচেষ্টা করে, তাতে ওই নারী অস্বীকৃতি জানান। ওই স্বর্ণকার গোপনে মুসলিম নারীটির (অগোচরে) পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের ওপরে গিঁট দিয়ে দেয়, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। ফলে তিনি উঠতে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। এ ভদ্র মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নরপিশাচের দল হো হো করে হাততালি দিতে থাকল। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায়

মৃতপ্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক (প্রতিবাদী) মুসলিম ঐ স্বর্ণকারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। প্রত্যুত্তরে ইহুদিরা মুসলিম লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে।নিহত মুসলিমটির পরিবার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাছে ফরিয়াদ করেন।এ ঘটনার পর রাসুল (সাঃ) এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে মদিনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লুবাবাহ ইবনে আবদুল মুনজির (রাঃ)-এর ওপর অর্পণ করে স্বয়ং হামজাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর হাতে মুসলিমদের পতাকা প্রদান করে আল্লাহর সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বনু কাইনুকা গোত্রের দিকে ধাবিত হন।আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রস্তভাব সৃষ্টি করলেন। অবশেষে বনু কাইনুকা গোত্র আত্মসমর্পণ করল এবং বলল যে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি এবং নারীদের ব্যাপারে যা ফায়সালা করবেন তারা তা মেনে নেবে। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তাদের সবাইকে বন্দি করে নেওয়া হয়। [ইবনে হিশাম: ২/৪৭, আর রাহিকুল মাখতুম (বাংলা) ২৪০-২৪২]

স্ত্রীদের সঙ্গে রাসুল (সা.) একসঙ্গে খাবার খেতেন এবং তাহাজ্জুদ নামাজেও তাঁদের ডেকে নিতেন। প্রতিনিয়ত তাঁদের শিক্ষা দিতেন যেন তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। হজরত আয়েশা (রা.) রাসুলের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন।

রাসুল (সাঃ) কন্যা সন্তানদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। রাসুল (সা.)-এর চার কন্যা ফাতেমা (রা.), জয়নব (রা.), উম্মু কুলসুম (রা.) এবং রুকাইয়া (রা.)। রাসুলের জীবদ্দশাতে ফাতেমা (রা.) ছাড়া বাকি তিন কন্যার মৃত্যু হয়। ফাতেমা (রা.) রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। কোনো সফরে যাওয়ার সময় মেয়ে ফাতেমা (রা.)-এর কাছে যেতেন সবার পরে আবার ফেরার পর প্রথমেই দেখা করতেন ফাতেমা (রা.)-এর সঙ্গে। ফাতেমা (রা.) যখনই রাসুল (সা.)-এর কাছে আসতেন, তিনি মেয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। চুমু দিয়ে হাত ধরে তাঁকে পাশে বসাতেন। মিশওয়ার বিন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'ফাতেমা আমার অংশ, যে ফাতেমাকে রাগান্বিত করল, সে যেন আমাকেই রাগান্বিত করল। [সহিহ বুখারি]

রাসুল (সা.)-এর যুগে নারীদের পদচারণ ছিল সর্বত্র। নারীরা যুদ্ধে গেছেন, মসজিদে জামাতে নামাজ পড়েছেন আবার অকপটে রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন প্রয়োজনীয় মাসআলা। জানতে চেয়েছেন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে।

মা হিসেবে ইসলামে নারীর মর্যাদা

মহান আল্লাহর সৃষ্টি শান্তির ধর্ম হল ইসলাম যা, মনবজাতির জন্য একমাত্র জীবন বিধান। মা হিসেবে নারীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেয় ইসলাম।মায়ের মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

‘আর আমি মানুষকে তার বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়াতে দু বছরে (সময়ের প্রয়োজন) হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার বাবা-মার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।‘[সুরা লোকমান: আয়াত ১৪]

রাসুল্ল (সাঃ), যখন কোনো অনুগত সন্তান নিজের মা-বাবার দিকে অনুগ্রহের নজরে দেখে, আল্লাহ তায়া’লা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবৌল হজ্বের সাওয়াব দান করেন। [বায়হাকি-মিশকাত, পৃ. ৪২১]

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের মর্যাদা ও উত্তম আচর পাওয়ার বেশি হকদার কে? এ প্রশ্নে তিনি প্রথম তিন বার মায়ের কথা বলেছেন। চতুর্থবার বাবার কথা বলেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?’ তিনি

বললেন 'তোমার মা'; সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা; সে আবারও বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা'। সে পুনরায় বলল, 'এরপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।' [বুখারি ও মুসলিম]

মহানবী (সা.) আরও ইরশাদ করেন, 'মায়েদের পদতলে জান্নাত।' [মুসলিম]

কোনো নারী যদি সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুবরণ করে তবে সে আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। (সুবহান আল্লাহ)

ওয়াইস কুরুনি (রহ.) মহানবী (সা.)-এর যুগের লোক ছিলেন। মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকায় তাঁকে নবীজি মদিনায় আসতে বারণ করেন। ফলে সাহাবি হওয়ার অনন্য মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তিনি মহানবী (সা.)-এর আদেশ মোতাবেক মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

রাসুল (সা.) মা আমিনাকে হারিয়েছেন শৈশবে। দুধমা হালিমাকে তিনি আজীবন মায়ের মতোই সম্মান করেছেন। নিজের চাদর খুলে তাঁকে বসতে দিতেন। সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন এবং উপঢৌকন পাঠিয়েছেন সন্তানের মতোই।

রাসুল (সা.)-এর জীবনের আরেক শ্রদ্ধেয় নারী উম্মু আইমান (রা.)। ক্রীতদাস ছিলেন এই সাহাবি। রাসুল (সা.) তাঁকে উম্মু বা মা বলে ডাকতেন এবং মায়ের মতোই ভালোবাসতেন। রাসুলের জন্মের পর তিনিই প্রথম তাঁকে কোলে নেন। রাসুল (সা.) তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁকে ছেড়ে যাননি।

ইসলামে 'মা' হচ্ছেন স্নেহের আঁধার, পুণ্যবতী, সন্তানের শুভ কামনাকারী, সুখ ও মানবতাময় এক শান্তির অতুলনীয় ঠিকানা।সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, 'মা বেহেস্তের মধ্যবর্তী দরজা।'

মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে হাজেমা (রা.) নামক এক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে জিহাদে শরীক হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হলাম। তখন নবীজি (সা.) বললেন তোমার মা কি জীবিত

আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন নবীজি (সা.) বললেন তুমি ফিরে যাও এবং তোমার মাতার সম্মান এবং খেদমতে লেগে যাও। কেননা তার দু পায়ের নিচেই বেহেশত রয়েছে"। কেননা মাকে যথাযথভাবে সম্মান দিলে তার উপযুক্ত খিদমত করলে এবং তার হক পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার সাধ্যমত চেষ্টা করলে সন্তানের জন্য বেহেশত যাবার পথ উন্মুক্ত হয়।

অন্যদিকে মায়ের মনে কষ্ট দিলে, তার অবাধ্য হলে, সে যতবড় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হউক না কেন তার বেহেশত লাভ করা কঠিন। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে নবীজি (সা.) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মা'দের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা তাদের হক নষ্ট করাকে চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।"

এতে কোন সন্দেহ এবং সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাম নেই মায়ের মনক্ষুণতা সন্তানের জন্য ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনেই অভিশপ্ত এবং এ অপরাধের শাস্তি আল্লাহ্ এ জগতেই বান্দাকে প্রদান করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত আছে- হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুবক সাহাবার নাম আলকামাহ। সে বিভিন্নভাবে দ্বীনের সাহায্য করত। আলকামাহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। এমন সময় তার জবান থেকে কালেমা শরীফ বের হচ্ছে না।সংবাদ শুনে বিশ্বনবি (সাঃ) জানতে চাইলেন, আলকামাহর পিতা-মাতা জীবিত আছে কিনা? হযরত বেলাল জানালেন,শুধুমাত্র তাঁর বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন।

খবর পেয়ে রাসূল (সা.) তার মাকে খবর পাঠান তিনি এলে, রাসুল (সাঃ) আলকামাহর মাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি পুত্রের উপর অখুশী? উত্তরে তিনি বললেন ইয়া রাসূল (সা.) আমার ছেলে আমার চেয়ে স্ত্রীকে বেশি গুরুত্ব দিত, তার কথা মত কাজ করত। তখন নবীজি (সা.) বললেন ঠিক এ কারণেই তার মুখে কালিমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছেন আল্লাহ্। তখন নবীজি (সা.) হযরত বিলাল (রা.) কে হুকুম দিলেন

আলকামাহকে আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দাও। আলকামার মা একথা শুনে চিৎকার করে বললেন আমার চোখের সামনে আমার সন্তানকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলে আমি কেমন করে সহ্য করব। রাসূল (সা.) তখন তাকে বললেন আপনার সন্তানকে ক্ষমা করে দিন তা না হলে সে অনন্ত কাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এ কথা শুনে মায়ের মন নরম হয়ে গেল তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দিলেন এবং আলকামাহর জবানে কালেমা শরীফ জারি হয়ে গেল।”

হজরত আলকামাহ এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন-

‘হে মুহাজির ও আনসারগণ! ভালো করে শুনে রাখ! যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের ওপর প্রাধান্য দিবে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তার ফরজ এবং নফল আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে কবুল নহে।‘

আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের মৃত্যু লাভসহ দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইসলামে মেয়ে হিসেবে নারীর মূল্যায়ন

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কন্যা জন্মলাভ হওয়াকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে করা হতো।কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফেরদের বদস্বভাব। কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচয় নয়। কন্যাসন্তানকে অশুভ বা অকল্যাণকর মনে করা ইসলামে একটি গর্হিত কাজ।

আল্লাহ্ বলেছেন, “আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে

হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে (কন্যাকে) রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট।” [সুরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন পুরুষ আর নারী। এভাবে সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার হিকমত ও কল্যাণ-জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা কাউকে চাইলে শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন। আবার কাউকে পুত্র সন্তান। কাউকে আবার পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন। কাউকে কাউকে আবার কোনো সন্তানই দান করেন না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা। [সূরা শুরা: ৪৯-৫০]

অর্থাৎ তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। তার না পুত্র সন্তান জন্ম হয়, না কন্যা সন্তান। শত চেষ্টা-তদবির করলেও তার সন্তান হয় না।সন্তান আল্লাহ তাআলা দান। বাবা মা তথা সবার জন্য সন্তান দুনিয়ার সেরাদান। দুনিয়াতে সন্তান লাভ আল্লাহ তাআলার এক মহা অনুগ্রহ।

আর সন্তানদের মধ্যে মা-বাবার জন্য কন্যা সন্তান আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। কন্যা সন্তান হলেই অনেক বাবা-মা মন খরাপ করে।ইসলাম এ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে। কন্যা সন্তান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্য একটি বিশেষ নেয়ামত। কন্যা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবারে সুখ ও বরকত দান করেন। কন্যা সন্তানের মা-বাবার জন্য নবীজি (সাঃ সুসংবাদ দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কন্যা সন্তান লালন-পালনকারীর জন্য তিনটি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

১) জাহান্নাম থেকে মুক্তি,

২) জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা

৩) জান্নাতে রাসুল (সা.) এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য।

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)'।

[মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮]

কন্যা সন্তানের মর্যাদায় আরও একটি হাদিস হলো, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে, একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দু'জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু'জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন হলেও।' [বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান: ৮৩১১]

কন্যাসন্তান তারা মা-বাবার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ তথা দাওয়াতনামা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করে। আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন,

'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর দুই মেয়ে হলে? তিনি বললেন, দুই মেয়ে হলেও।' [বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নংঃ ৮৩১৩]

আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে তার দুই মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই

দেখতে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করললো এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলো। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলোল না। তারপর নারীটি ও তার মেয়ে দু'টি উঠে পড়লো এবং চলে গেলো। ইত্যবসরে আমার কাছে নবী (সা.) এলেন। আমি তার কাছে ওই নারীর কথা বললাম।

নবী (সা.) বললেন, 'যাকে কন্যা দিয়ে কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে।' [মুসলিম, হাদিস নং: ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ২৪৬১৬]

হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তায়ালা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।' [কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১]

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে কন্যা সন্তান তথা নারীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করার তাওফিক দান করুন। কন্যা সন্তান তথা নারীদের অন্যায় বা গুনাহের পথে পরিচালিত করা থেকে বিরত রাখার তাওফিক দান করুন। কুরআন-সুন্নাহর সর্বোত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করার তাওফিক দান করুন।

একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

মহান আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল (সাঃ) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে সবাই নিজ নিজ দায়িত্বে সক্রিয় হলে তখন কারো অধিকার ভূলুণ্ঠিত হবে না, সবাই নিজ নিজ অধিকার সুরক্ষিত পাবে। মালিক যখন তার দায়িত্ব পালনে সচেতন হবে, তখন শ্রমিকের অধিকারও যথাযথ আদায় হবে। স্বামী কর্তব্যপরায়ণ হলে আর স্ত্রীর অধিকার বাধাগ্রস্ত হয় না; স্ত্রী নিজ দায়িত্বে যত্নবান হলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না।

আল্লাহ্ বলেছেন,তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। [সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮৭]

মহানবী (সা.) বিদায় হজের ভাষণে দীর্ঘ বয়ানের একপর্যায়ে বলেছিলেন, 'অতএব, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গে গ্রহণ করেছ এবং তোমরা আল্লাহর হুকুমেই তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল হিসেবে পেয়েছ।' [সহিহ মুসলিম: হাদিস ১২১৮]

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আর তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। আর যদি তাকে তোমার অপছন্দও হয়, তবু তুমি যা অপছন্দ করছ আল্লাহ তাতে সীমাহীন কল্যাণ দিয়ে দেবেন।' [সুরা: নিসা, আয়াত: ১৯]

ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় একজন স্বামী যেন তার স্ত্রীর সাথে সঠিক ব্যাবহার করেন। স্ত্রী কোন ভুল করলে তা ক্ষমা করে তার ভাল গুল গুলোর উপর সন্তুষ্ট হতে। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন মহিলার ওপর রুষ্ট হবে না, কেননা যদি তার কোনো কাজ খারাপ মনে হয়, তাহলে তার এমন গুণও থাকবে, যার ওপর সে সন্তুষ্ট হতে পারবে।' [সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৯]

আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের জন্য আল্লাহ পুরুষদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আদর্শ স্ত্রী নির্বাচন করতে।স্ত্রীর নির্বাচনের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন,

''তোমাদের মধ্যে যারা আই ইম। স্বামীহীন নারী। তাদের বিয়ে কর। এবং তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্থ হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।'' [সূরা নুর আয়াতঃ৩২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,তোমরা চার গুণ দেখে মেয়েদের বিয়ে কর।তার সম্পদ,তার বংশ পরিচয়,তার সৌন্দর্য এবং ধার্মিকতার জন্য। অতঃপর তুমি ধার্মিকতাকে। অগ্রাধিকার দাও। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [সহীহ বুখারী হাদিস ৫০৯০]

হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নারীদের প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ দাও।' [সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫১৮৪]

অন্য হাদিসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ভালো মানুষ তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।' [সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ১১৬২]

ইসলামী শরিয়তে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য যে অধিকার সাব্যস্ত করেছে, আর তা হল,

- পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেওয়া,
- প্রয়োজনমাফিক অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ভালো ব্যবস্থা করা
- স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা
- মাঝেমধ্যে মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেওয়া
- প্রয়োজনমাফিক দ্বিন শেখানোর ব্যবস্থা করা
- ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা
- প্রয়োজনমতো সহবাস ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ইত্যাদি

বিয়ের জন্য দেনমোহর অপরিহার্য। এটি স্ত্রীর পাকাপোক্ত অধিকার। এ অধিকার আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। মোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত স্ত্রী চাইলেই নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখতে পারে। বস্তুত মোহরানা পবিত্র বন্ধনের বাহ্যিক দায়বদ্ধতা আর নারীর ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা। মোহর কোনো অর্থ-বিত্তের প্রতিযোগিতা নয়, এটি স্বামীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে কোনো ধরনের অস্বীকার

করার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের দেনমোহর দিয়ে দাও।' [সুরা: নিসা, আয়াত: ৪]

কোন পুরুষ যদি দেনমোহর দিতে আপত্তি করে বা স্ত্রীকে বলে পরে দিব বলে ক্ষমা চেয়ে স্ত্রীর দেনমোহর আদায় না করে তবে তা হবে মারাত্মক অন্যায়। এব্যাপারে হাদিছে রয়েছে,

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ের সময় মোহরানা নির্ধারণ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের খবর জানেন যে তার তা আদায় করার নিয়ত নেই। ফলে সে আল্লাহর হকের মধ্যে ওই নারীকে ধোঁকা দিল এবং তার লজ্জাস্থানকে অন্যায়ভাবে ভোগ করল। এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে ব্যভিচারী হিসেবে।' [মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৮৯৩২]

ইসলামী শরিয়া মতে, বিবাহের পর থেকেই একজন স্বামীর তার স্ত্রীর সমপূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। ইসলামী শরিয়তের ভাষায় স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সন্তানের পিতার ওপর সন্তানের মায়ের জন্য অন্ন-বস্ত্রের উত্তম পন্থায় ব্যবস্থা করা একান্ত দায়িত্ব।' [সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৩]

আল্লাহ ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের ঘরে বাসস্থানের ব্যবস্থা করো।' [সুরা: তালাক, আয়াত: ৬]

হাদিস শরিফে স্ত্রীদের ভরণ পোষণের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'তুমি যখন খাবে, তাকেও খাওয়াবে এবং তুমি যখন পরবে, তাকেও পরাবে। চেহারায় কখনো প্রহার করবে না, অসদাচরণ করবে না।' [আবু দাউদ, হাদিস: ২১৪২, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১৮৫০১]

বৈধতার সীমারেখায় স্ত্রীকে যথাসম্ভব আনন্দে ও প্রফুল্ল রাখা হলো স্বামীর প্রতি শরিয়তের নির্দেশ। আয়েশা (রা.) সূত্রে, এক সফরে (একটি জনমানবহীন নির্জন

উপত্যকায়) নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। পরবর্তী সময় আমি স্বাস্থ্যবান হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার তিনি আমাকে পেছনে ফেলে দিয়ে বিজয়ী হলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। [আবু দাউদ, হাদিসঃ ২৫৭৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করত: তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন: স্ত্রীর ভালবাসা, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানিত ব্যক্তিকে কোন ক্রমেই অপমানিত করবে না।

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’ [সূরা বাক্বারাহঃ আয়াত ২৩২]

হাদীছে এরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর অধিকার

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনের প্রথম আয়াত যা নবী (সাঃ)-এর উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয়

তা হল,

'Recite in the name of your Lord who created'

'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'[সূরা আলাক: ১]

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বানীতে স্পষ্টভাবে নর-নারীর উভয়কেই শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।' [বুখারী: ৪৭৩৯]

ইসলামে শিক্ষা অর্জন করা নর-নারীর সমান অধিকার। কারণ শিক্ষা ছাড়া আল্লাহকে চেনা যাবে না, আল্লাহর হুকুম মানা যাবে না বিধায় শিক্ষা গ্রহণ করা প্রথম ও প্রধান ফরজ। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে-

'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।' [সূরা ফাতির: ২৮]

শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শুধু পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। আর সে জন্যই মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।' (ইবনে মাজাহ: ২২৪) সুতরাং ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বেশেষে সবার জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, দুনিয়া পুরাটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হল পুণ্যশীলা নারী (মুসলিম হা/১৪৬৭)

তিনি আরও বলেন, সোনা-রূপার চেয়ে মূল্যবান হল ঐ স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের পথে সহযোগিতা করে। (ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬)

পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও নবী (স.)-এর কাছে তালিম নিতেন। সম্ভ্রান্ত নারীদের সঙ্গে সঙ্গে দাসীদেরও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহানবীর কাছে পুরুষ সাহাবিরা যেমন জ্ঞান শিখতেন, তেমনি মহিলা সাহাবিরা জ্ঞান শিক্ষা করতেন। শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারীজাতিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বহু হাদীসে তাগিদ দিয়েছেন।

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহিত করে প্রিয় নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান বা তিনটি বোনকে লালনপালন করবে এবং তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল (স.), কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দুজনের জন্য এরূপ করলেও।' [বুখারি]

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, 'নারীরা প্রিয়নবী (সা.)-কে বলল. আপনার কাছে পুরুষরা এতো ভিড় লাগিয়ে থাকে যে অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শোনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। মহানবি (সা.) নারীদের মতামত অনুযায়ী তাঁদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.), হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), হজরত ফাতেমাতুজ জাহরা (রা.), হজরত হাফসা (রা.), হজরত উম্মে কুলসুম (রা.) প্রমুখের মতো মহীয়সী নারীরা নৈতিক শিক্ষা ও জ্ঞানের নানা শাখায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ইসলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরকে কতবেশি মর্যাদাবান করেছেন তার প্রমান হযরত আয়েশা (রাঃ) । হযরত ওরওয়া বিন যোবায়ের বর্ণনা থেকে তার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।তিনি বলেন, কোরআনের ইলম,ফারায়েযের ইলম এবং হালাল-হারামের মাসায়িল

ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চেয়ে বড় কোন আলিম দেখিনি আমি । হযরত ওরওয়া আরো বলেছেন, কবিতা, সাহিত্য, চিকিৎসা এবং ইতিহাস সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) চেয়ে বড় জ্ঞানী আমি দেখিনি। আয়েশা (রাঃ) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মর্যাদায় ছিলেন অনেক পুরুষ সাহাবীর থেকেও উপরে। হজরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০, যা সব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিতীয় উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফছা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্য মহিলা সাহাবীরা লিখতে জানতেন। সর্বোচ্চ।৩৭৮ হাদিস উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। সাহাবীরা যখনই কোন মাসআলার ব্যাপারে সন্দিহান হতেন বা সমস্যায় পড়তেন তখনই ওনারা পর্দার আড়াল থেকে হযরত আয়শা (রাঃ) এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন এবং সঠিক সমাধান পেতেন। এথেকে বুঝা যায় পর্দায় থেকে মহিলাদের জন্য শিক্ষকতা করা বা মহিলাদের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই। ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতে পারলে নারীদের জন্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, বরং উচ্চশিক্ষা লাভ করতেও কোনো বাধা নেই।

ইবনে আসাকির বলেছেন, ইমাম বুখারী যেসকল নারী মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তার সংখ্যা ছিলো আশির উপরে। এভাবে মহানবী (সাঃ)মুসলিম নারীদের অন্তরে জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ইবনে সাদ তাঁর 'তাবাকাতে'৭০০ নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বা তাঁর সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর 'আল-ইসাবাহ ফি তামায়িজিল হাদিস' নামক গ্রন্থে এক হাজার ৫৪৩ জন নারী হাদিসবিশারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন অনেক নারী চিকিৎসাসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধে আহতদের

সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা নবী কারীম কারিম (সাঃ) এর সঙ্গে যুদ্ধেও গমন করতেন। নুসাইবা বিনতে কাব আল-আনসারী (রা.) ছিলেন মদীনার একজন প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক। উম্মে আম্মারা নামে বেশি খ্যাত এই নারী সাহাবি। সুতরাং ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই নারীসমাজের জ্ঞান চর্চার ব্যপারে নারী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং এ ধারাবাহিকতা পরবর্তী যুগেও অব্যাহত ছিলো।

'সুরা নুর' মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং নারীজাতির অহংকার। ওমর (রা.) বলেছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নারীদের সুরা নুর শিক্ষা দাও।'

পুরুষের ন্যায় নারীরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখবে। পবিত্র কোরআনেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'হে নবী পরিবার! তোমাদের গৃহে যে আল্লাহর বাণী পাঠ করা হয় এবং হিকমত পরিবেশন করা হয় তা তোমরা স্মরণ কর।' [সূরা আহযাব: ৩৪]

নারীদের শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।' [সূরা নিসা: ১৯]

একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, "তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিব।"

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে একজন শিক্ষিত মা পারেন পরিবারের প্রত্যেকটা শিশুকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। মা যদি মূর্খ হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মূর্খই থেকে যাবে। শিশুদের উপর মায়ের চারিত্রিক প্রভাব থাকে সব চেয়ে বেশি। তাই শিশুর আদব-শিষ্টাচার নির্ভর করে একমাত্র তার মায়ের শিক্ষার উপরই। আর শিশুকে শিক্ষিত করতে হলে মায়ের শিক্ষিত হওয়া অনিবার্য।

রসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।' [বুখারী: ৪৭৩৯)]

একটি পরিবারকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বৃটিশ আমলে মুসলমান নারীরা নিজেদের উদ্যোগে ঘরেই শিক্ষিত হয়েছে।

মধ্যযুগেও মুসলিম নারীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সুতাইতা আল-মাহামালি নামের এক নারী গণিতবিদ বাগদাদের এক বিদ্যোৎসাহী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাগদাদের একজন বিচারপতি ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

নারী সম্মান, মর্যাদা ও মাতৃত্বের প্রতীক। শরীয়তনুমোদিত উপায়ে নারী জাতির উন্নয়ন, শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও তৎপরতাকে ইসলাম কল্যাণকর মনে করে।

রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামিয়া (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন মদিনার অন্য একজন নারী চিকিৎসক। তাঁকে ‘ইসলামের প্রথম নার্স’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূলত তাঁর চিকিৎসক পিতা সাদ আল-আসলামির নিকট থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শিফা বিনতে হারেস ইসলামে সর্বপ্রথম পারিবারিক শিক্ষিকা ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান ও উম্মে শারিক ইসলামের প্রসিদ্ধ দাঈ ছিলেন। নারী তাবেঈনদের মধ্যে হাফসা বিনতে সিরিন ইবাদত, ফিকহ ও কোরআন-হাদিসের সুগভীর জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একজন নারী শিক্ষিকা নাফিসা বিনতুল হাসানের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে হাদিস শুনতেন।

কর্মজীবন বা কর্মস্থানে নারীর মুল্য

Islam has given dignity to the deprived women of the pre-Islamic era. Islam has ensured gender equal opportunity and women's privileges in every sphere of their life and there is no discrimination between men and women. Islam has provided guidelines for the safety of women in the workplace to ensure their work environment. [Jagannath University Journal of Arts]

ইসলাম ধর্মে একজন নারীর ব্যয়ভার পর্যায়ক্রমে পিতা, স্বামী ও সন্তানের ওপর ন্যস্ত। তা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর জন্য স্বহস্তে উপার্জনের পথ খোলা রেখেছে।ইসলামী শরিয়তের বিধান মেনে মুসলিম নারীরাও উপার্জন করতে পারে। চাকরি করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে।ইসলাম কখনো নারীকে দমিয়ে,চাপিয়ে বা চার দেওয়ালে আটকে রাখেনি। একজন নারী তার স্বকীয়তা, শালীন এবং সুস্থ পরিবেশে উপার্জন করতে পারবেন। প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে পর্দা রক্ষা করে। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর আয়ের অনেক উৎস ও মাধ্যম থাকলেও ব্যয়ের বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। ইসলাম নারীর ওপর অর্থনৈতিক কোনো দায়-দায়িত্ব চাপায়নি।পরিবারের যাবতীয় আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করা পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে। সেহেতু নারীর চাকরি তার ইচ্ছাধীন।

মহান আল্লাহ ব্যবসার বৈধতা দিয়েছেন। এই বৈধতা নারী ও পুরুষ সবার জন্য। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'হে মুমিনরা, তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা করা বৈধ।' [সুরা: নিসা, আয়াত: ২৯]

মহান আল্লাহ বলেন, 'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাজি, তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারী।

নারীদের মধ্যে একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে।সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে, তারা যেন অস্বীকার না করে। এটা ছোট হোক, বড় হোক মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনো ধরনের বিরক্ত হইয়ো না।' [সুরা: বাকারা, আয়াতাংশ: ২৮২]

নবী কারিম (সাঃ) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাশীল সফল ব্যাবসায়ি। সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যাঁর বাণিজ্য চলত। খাদিজা (রাঃ) আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলামের আগ্রগতিতে বিরাট ভুমিকা রেখেছিলেন। ইবনে সা'দের এ মন্তব্য দ্বারা খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। খাদিজা (রাঃ) এর সাথে যুক্ত সম্মানসূচক উপাধির মধ্যে ছিল, "আমিরাত-কুরাইশ" (কুরাইশের রাজকুমারী), "খাদিজা আল-কুবরা" (মহান খাদিজা) ।

সাইয়িদা খাদিজা (রা.) কয়েকটি নীতি ও কৌশল মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

- তার মধ্যে প্রধানটি হল স্বকীয়তা
- আমানতদার ও বিশ্বস্ত কর্মী নিয়োগ
- যথার্থ মানবসম্পদের সরবরাহ
- বাণিজ্যিক সফরে অভিজ্ঞ লোক মনোনয়ন
- চুক্তির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ও লভ্যাংশ প্রদান করা

সাইয়িদা খাদিজা (রা.) নিজ ব্যাবসা পরিচালনা করেছেন ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রেখে । স্বামী মারা যাওয়ার পর মক্কার অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছেন, এমনকি তাদের ব্যবসায় অংশীদারত্ব প্রদানের প্রস্তাবও করেছেন; কিন্তু সাইয়িদা খাদিজা (রা.) সংযতভাবে সকল প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মূলত দুটি কারণে। একটি কোনোভাবেই তিনি তার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে চাননি। দ্বিতীয় ব্যবসায় তিনি নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে চাননি। খাজিদা (রা.) শামের সফরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মাইসারাকে পাঠানোর অন্যতম কারণ ছিল যে তিনি মাইসারা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, ভদ্র ও পরিশ্রমী।

ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে ব্যবস্থাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা, আমানতদারিতা এবং বিশ্বস্ততার গুণকে প্রাধান্য দিয়েছেন খাদিজা (রা.)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর মুগ্ধতার কারণও ছিল তাঁর সৎ, আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা।

ব্যবস্থাপক হিসেবে সফরে যাওয়ার জন্য খাদিজা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রস্তাব দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতার জন্য সাথে ভৃত্যও দেওয়া হবে। এ বিষয়টিও খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসায়িক পারদর্শিতা এবং দক্ষ পরিচালনাগুণের প্রমাণ বহন করে।

রাসুল (সা.) এর নেতৃত্বে শামের বাণিজ্যসফরে বুসরা বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রিতে অতীতের সব সফরের তুলনায় বিপুল লাভ হলো। বুসরা থেকে ক্রয় করে আনা পণ্যদ্রব্য মক্কায় বিক্রি করেও বিপুল মুনাফা অর্জিত হলো। সফলতার এই আনন্দে খাদিজা (রা.) রাসুলুল্লাহকে চুক্তির অতিরিক্ত পারিশ্রমিক-লভ্যাংশ দিয়েছিলেন। [দালায়িলুন নুবুওয়াহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭৩-১৭৪; সীরাত বিশ্বকোষ, মাকতাবাতুল আযহার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৭]

রাসুল (সাঃ) এর সপ্তম স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ছিলেন। জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর বাবা ছিলেন জাহাশ ইবনে রাবাব। ইসলামপূর্ব যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আসেন এবং কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে অংশীদারি কারবারে সম্পৃক্ত হন। জয়নব বিনতে জাহাশকে (রা.) হস্তশিল্পে পারদর্শী নারী ছিলেন। আরবিতে তাঁকে ‘সান্নাউল ইয়াদ’ বলা হতো। দানশীলতার কারনে জনয়ব (রা.)–কে উম্মুল মাসাকিন বা অসহায়-দুস্থদের মা বলা হতো (সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা: ২১২)

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ, সবার আগে সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।’আয়েশা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সাঃ) কথা শুনে আমরা একে অপরের হাত মেপে দেখলাম, কার হাত সবচেয়ে লম্বা! প্রকৃত অর্থে জয়নবের হাত দীর্ঘ ছিল। কারণ, হাতের দৈর্ঘ্য বলতে রাসুলুল্লাহ (সা.) দানশীলতা ও উদারতা বুঝিয়েছেন। জয়নব (রাঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সদকা করতেন ।’ [মুসলিম, হাদিস: ২,৪৫২]

তাঁর দানশীলতার স্বীকৃতি দিয়ে আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'বিপুল দানশীলতার ক্ষেত্রে জয়নবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী আমি কখনো দেখিনি।' [মুসলিম, হাদিস: ১,৮৯২]

আয়েশা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন, 'জয়নব ছিলেন হস্তশিল্পে পারদর্শী নারী। নিজ হাতে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে আল্লাহর রাস্তায় দান করাতে তাঁর জুড়ি ছিল না।' (আস-সিমতুস সামিন ফি মানাকিবি উম্মাহাতিল মুমিনিন, ইবনুল কাস, পৃষ্ঠা: ১২৮)

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, যা একবার শুনতেন সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলতেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.) শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন। বসরার যুদ্ধে হেরে যাবার পর আয়িশা মদিনায় ফিরে যান এবং একজন শিক্ষক হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে নারীদের বিভিন্ন বিষয় তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হতো । তিনি হাদিস শিক্ষাদানে বেশি সময় ব্যয় করতেন । একসাথে তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০০-এর অধিক। হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আমর ইবনে আছ (রা.) প্রমুখ সাহাবি তাঁর হাদিসের পাঠদানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন । খলিফা উমরের শাসনামলেও তিনি দাপটের সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহে মতামত প্রদান করার স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন।

রাসুল (সাঃ) নারী সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন রুফাইদা আল আসলামিয়া (রাঃ) ।তিনি একজন দক্ষ সেবিকা ছিলেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দক্ষতা দিয়ে মহানবী (সাঃ) এর স্ত্রী তিনি আয়েশা (রাঃ) এবং অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিতেন।

আহতদের সেবায় মসজিদে একটি তাঁবু করেছিলেন, খন্দকের যুদ্ধে সাদ বিন মুয়াজ বনু মখজুম গোত্রের আবু ওসামা জাশমী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একটি তীর দ্বারা আহত হন। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন তাকে দ্রুত রুফাইদার তাঁবুতে নিয়ে যাও। খাইবার যুদ্ধে আহত মুসলিম মুজাহিদদের সুস্থ করতে তিনি মাতৃত্বের মমতাময়ী হাত বাড়িয়ে দেন। তার

এই অবিস্মরণীয় কুরবানী এবং সেবা-শুশ্রূষার স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল পুরুষ মুজাহিদদের সাথে তাকেও গনিমতের মালের হিস্যা দেন।

ইসলাম প্রচারের কাজে অনেক নারী সাহাবিরা সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাদের মধ্যে নুসাইবা বিনতে কা'ব ছিলো অন্যতম। তবে সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত হলো ইসলামের প্রথম শাহিদা। ইসলামের সূচনালগ্নে মক্কায় যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা প্রকাশ করেছিলেন, সুমাইয়া ছিলেন তাদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি।মক্কার মুসলিম বিদ্বেষী কুরাইশ বংশের ও কাফিরদের নেতা আবু জেহেল তার তলপেটে ছুরি ঢুকিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। সুমাইয়া (রা.)-কে নির্মমভাবে হত্যার পর রাসুল (সা.) তার নাম রাখেন আবু জাহল বা মূর্খ।

নবী (সা.) এর আমলের বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবি ছিলেন যারা মদিনার বাজারে বিভিন্ন ব্যবসা করত এমনকি অনেকে কৃষি কাজও করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে অনেক নারী আছেন যারা শালীনতা বজায় রেখে উপার্জনে ক্ষমতাবান হয়েছেন।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এর খালা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পরে খেজুর বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করতেন। রাসূলুল্লাহ (দরুদ) এটা জানতে পেরে বললেন, "এতে কোনো ক্ষতি নেই।"মহিলা সাহাবি কিবলাহ (রা.) বাজারে ব্যবসা করতেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী রায়িতা (রা.) ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। উহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারা (রা.) শত্রুদের তরবারির ডজনখানেক আঘাত সহ্য করেও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে রাসূল (সা.)-এর ওপর আক্রমণকারী শত্রুদের প্রতিহত করেছিলেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রা.) এর সময় উম্মে শিফা বিনতে আবদিল্লাহ নামক এক আইনজ্ঞ মহিলা ছিলেন। ওমর (রা.) তাকে ইসলামী আদালতের কাজাউল হাসাবাহ (Accountability Court) ও কাজাউস সুক (Market Administration) ইত্যাদির দায়িত্বভার অর্পণ করেন । [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৭৮]

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম যেভাবে একজন পুরুষের জন্য তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী করেছে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, ঠিক তেমনি একজন নারীর জন্যও প্রযোজ্য। একজন উপার্জনকারী নারী তার ইচ্ছামতো খরচের অধিকার রাখে। এটাই ইসলামের বিধান। কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে, ‘পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।‘ [সুরাহ নিসা- ৩২]

পর্দা ও নৈতিকতাকে সুদৃঢ় রেখে নারীদের কর্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করা জাতীর উন্নয়নের অপরিহার্য অংশ।

বিধবা নারীর মর্যাদায় ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন বিধবা কখনোই সমাজ-সংসারের বোঝা নয়। ইসলামের শুরু থেকেই বিধবাকে ইসলাম মর্যাদার আসনে বসিয়েছে।একজন বিধবা ইসলামে কত বেশি মূল্যবান তা এই হাদিস পরলেই জানা যাইয়, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন, আমিই ঐ ব্যক্তি যার জন্য সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে। কিন্তু এক মহিলা এসে আমার আগে জান্নাতে যেতে চাইবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, তোমার কি হল? তুমি কে? তখন সে বলবে, আমি ঐ মহিলা যে স্বীয় এতিম বাচ্চার লালন পালনের জন্য নিজেকে আটকে রেখেছে। (বিবাহ করা থেকে) [মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং-৬৬৫১]

রাসুলের (সা.) স্ত্রীদের মধ্য হতে শুধুমাত্র উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) ছাড়া সবাই ছিলেন বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা। স্বয়ং নবী (সা.) যুবক বয়সে প্রথম যাকে বিয়ে করেন তিনিও ছিলেন একজন বিধবা নারী। নবী (সা.) প্রথমেই বিধবা নারীকে বিয়ে করার মাধ্যমে বিধবা নারীদের পক্ষ অবলম্বন করে জগদ্বাসীদের মধ্যে এক অনন্য

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিধবাদের বিয়ে করা দোষের কিছু নয়। তিনি যে শুধু বিধবাদের বিয়ে করেছেন তানয়, বরং বিধবা নারীদের বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন।

কোরআনুল কারীমে বিধবা নারীদের বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং তাদের নিজেদের স্ত্রীদের রেখে যাবে, সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেরা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা (ইদ্দত পালন) করবে। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করে নেবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোনো পাপ নেই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রয়েছে।' [সূরা বাকারা: ২৩৪]

যেসব বিধবা বিয়ের যোগ্য বয়সের নয়, আবার তাদের কোন সন্তানও নেই। মহানবী (সা.) বিধবা নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন।সেসব বিধবাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াকে অনেক বড় পূণ্যের কাজ বলে রাসূল সা. ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, 'বিধবা এবং মিসকিনের সহযোগিতাকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়, বা সর্বদা রাতে নামাযরত ও দিনের বেলা রোযাদার ব্যক্তির মত।'[সহীহ বুখারী]

বিধবা নারীকে সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অধিকার দিয়েছে ইসলাম। বিধবাকে দেওয়া ইসলামের প্রধান প্রধান মূল্যায়ন হল,

- **সম্পদের উত্তরাধিকারঃ** ইসলাম বিধবা নারীকে স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছে। বিধবা নারী সন্তান ও সন্তানের সন্তানের সঙ্গে স্বামীর সম্পদের এক-অষ্টমাংশের মালিক হয় আর সন্তান ও সন্তানের সন্তান না থাকলে এক-চতুর্থাংশের মালিক হয়।

  এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন,

  'আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে

গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে।'
[সূরাঃ আন-নিসাঃ আয়াত ১২]

- **বিয়ে ও নতুন জীবনঃ** ইসলাম বিধবা নারীকে শুধু বিয়ের অনুমতি দেয়নি; বরং উৎসাহিত করেছে। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করার পর বিধবা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে বাধ্য করতে বা বাধা দিতে পারবে না। মহানবী (সা.) বলেন, 'বিধবা ও মিসকিনদের সহায়তা দানকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী অথবা রাত্রিবেলা সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালনকারীর ন্যায়।' [বুখারি : ৫৩৫৩]

- **সন্তানের দায়িত্ব শুধু বিধবা নারীর নয়ঃ** সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধবা নারী তার জীবন ও যৌবন বিসর্জন দেয় অথবা সন্তানের দোহাই দিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখা হয়। ইসলাম বিধবা নারীকে সন্তানের 'একক দায়' থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলামী শরিয়ত মতে, সম্পদ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার অবর্তমানে দাদা সন্তানের অভিভাবক এবং তার অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক অভিভাবক নির্ধারণ করে দেবে। অবশ্য মা সন্তান প্রতিপালন করবে যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে করে।

  আল্লাহ্ বলেছেন, 'তবে সন্তান প্রতিপালনের অজুহাতে মায়ের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, 'কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।'[সুরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৩]

- **সামাজিক অধিকার ও মর্যাদাঃ** মহানবী (সা.) বিধবা নারীকে বিয়ে করে তাদের প্রতি সামাজিক অবহেলা, মানবিক কারণ, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে তৎকালীন আরবের কুসংস্কার উচ্ছেদ করেছিলেন ও অবজ্ঞার পথ বন্ধ করেছিলেন । তিনি বিধবার প্রতি সদয় আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, 'বিধবা ও মিসকিনের জন্য খাদ্য জোগাড়ে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মতো।' [সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৩৫৩]

  হাদিসে এসেছে, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো বিধবা ও অভাবীর সঙ্গে পথ চললে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন।' [সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ১৪২৫]

বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মোহরানা, স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং পিতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যে সম্পদ নারীরা পান তা একান্তভাবেই তাদের। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে বিধবাদের অবমূল্যায়ন করা হলেও ইসলাম ধর্ম বিধবাকে মূল্যায়ন করেছে। তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বিধবাকে কখনো 'অপয়া'মনে করেনি।

সম্পত্তির অধিকার

ইসলাম নারীকে শুধু সামাজিক মর্যাদাই দেয়নি দিয়েছে অর্থনৈতিক অধিকারও। সর্বোপরী ইসলাম উত্তরাধিকারে নারীকে যথাযথ অধিকার প্রদান করেছে। মুহাম্মাদ (সা.) ১৪০০ বছর আগে মরুভূমির প্রান্তে দাঁড়িয়ে উত্তরাধিকারসহ সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

একজন পূর্ণ বয়স্ক মুসলিম নারী, তিনি বিবাহিত হন বা নাই হন, কারো সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হতে পারেন, মালিকানা হস্তান্তরও করতে পারেন। রয়েছে তার মাতাপিতার পরিত্যক্ত স্পত্তিতে ন্যয়সঙ্গত অধিকার।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, কম হোক বা বেশি হোক। এ অংশ সুনির্ধারিত।' [সুরা নিসা, আয়াত: ৭]

উত্তরাধিকারে নারীর অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে পবিত্র কোরআন। যদি কোনো নারীর কোনো ভাই না থাকে তাহলে তিনি (একা হলে) পিতার ত্যাজ্য সমুদয় সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা দুই বোন বা ততধিক হন এবং কোনো ভাই না থাকে তাহলে তারা তাদের পিতা/মাতার সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবেন। যদি এক বোন এবং এক ভাই হয় তাহলে একজন ভাইয়ের অংশের অর্ধেক পাবেন একজন বোন। অর্থাৎ যদি কেউ এমতাবস্থায় মারা যায় যে তার এক পুত্র ও এক কন্যা (আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই)। তাহলে সমুদয় সম্পত্তি তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবে পুত্র আর এক ভাগ পাবে কন্যা। এক পুত্র ও দুই কন্যা থাকলে সমুদয় সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ পাবেন পুত্র। আর বাকি দুই ভাগ পাবেন দুই কন্যা (প্রত্যেক কন্যা এক ভাগ করে)। নারী এবং পুরুষ উভয়ের এই অধিকার রয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা সীমালংঘন এর অন্তর্ভুক্ত। আর পিতার

মৃত্যুর পর বোনদের কোনো অংশ না দিয়ে সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করা অতি নিকৃষ্ট কাজ এবং বেইনসাফি।

পবিত্র কোরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। আর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তাহলে তাদের জন্যে ওই ত্যাজ্য মালের তিন ভাগের দুই ভাগ। আর যদি (কন্যা) একজনই হয় তাহলে সে জন্য অর্ধেক।' [সূরা নিসা: ১১]

স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে নারীর অধিকার। যদি কারো স্বামীর ইন্তিকাল হয় আর সে স্বামীর কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর সমূদয় সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবেন। আর যদি স্বামীর সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাবেন এক-অষ্টমাংশ (আট ভাগের এক ভাগ) । পবিত্র কোরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে, 'স্ত্রীদের জন্য তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ।'। [সূরা নিসা: ১২]

ন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও রয়েছে মায়ের অধিকার। মা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের ইন্তিকাল হলে সন্তানের যদি কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে সেই সন্তানের সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পাবেন মা। আর যদি মৃত সন্তানের কোনো সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে মা সেই (মৃত) সন্তানের সম্পত্তির একশষ্টমাংশ (ছয় ভাগে এক ভাগ) পাবেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'মৃতের কোনো পুত্র থাকলে পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য (সন্তানের) ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবেন তিন ভাগের এক ভাগ।। [সূরা নিসা: ১১]

ইসলাম ধর্মে ঋতুবতী নারীর অবস্থান

বালেগ হওয়ার পর মহিলাদের প্রতিমাসে ৬/৭ দিন বা কমবেশি মেয়াদে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এটাকে বলা হয় মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয। আর সন্তান প্রসবের পর রক্ত রক্তক্ষরণ হয় প্রায় ৪০ দিন ব্যাপী। এটাকে বলা হয় নিফাস। এ দুঅবস্থায়ই মহিলাদেরকে ঋতুবর্তী বলা হয়।প্রতি মাসে সঠিক সময়ে মাসিক শুরু হওয়ার মাধ্যমে নারীর শারীরিক সুস্থতা ও সন্তান ধারণে সক্ষমতা নিশ্চিত হয়। ইসলামী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী একজন নারীর ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন।

এ দুঅবস্থায় মেয়েদের কয়েকটি কাজ ও ইবাদত ইসলামে নিষিদ্ধ রয়েছে।সেগুলো হল,সালাত, সাওম ও স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন, কুরআন স্পর্শ করা, মাসজিদে যাওয়া ও কাবা তাওয়াফ করা। এর কারণ হল এই দিনগুলোতে একজন নারীর যথাসাধ্য বিশ্রামের দরকার।তাই এই দিনগুলোতে ইসলাম নারীকে এক মাত্র আল্লাহ্‌র আদেশই নামাজ-রোজা, যৌন মিলন, কুরআন স্পর্শ করা, মাসজিদে যাওয়া ও কাবা তাওয়াফ করা থেকে দায়মুক্তি দিয়েছে। ওই দিন পর্যন্ত বন্ধ রেখে এর পর থেকে আবার যথাসময়ে আবার এই ইবাদতগুলো নারীরা পালন করবে। মহান আল্লাহ্‌ এ অবস্থায় নারীদের নামাজের কাজার আদেশ দেননি, কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোজা কাজা করার আদেশ দিয়েছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন, 'লোকেরা আপনাকে হায়েজ তথা ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তা অপবিত্রতা। অতএব তোমরা হায়েজের সময় স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকো এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়।' [সুরা বাকারা, আয়াত ২২২]

আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.) এব্যাপারে ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ঋতুবতীর সঙ্গে মিলিত হয় কিংবা কোনো নারীর পশ্চাদ্দ্বারে সঙ্গম করে অথবা কোনো গণকের কাছে

যায়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে।’ (তিরমিজি, হাদিস: ১৩৫)

এবং সায়েন্টিফিক এটা প্রমাণিত এ সময় স্ত্রী সহবাস করা অনুচিত। কারণ এ সময় স্রাবের রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বের হয়ে থাকে, যা সহবাসের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ সময় সহবাস নিষিদ্ধ। স্ত্রীদের ঋতুস্রাবকালীন সহবাস ব্যতীত যাবতীয় জাগতিক কাজকর্মে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের আদর্শ।

রাসুল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে ঋতুবতী অবস্থায় একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, একই বিছানায় একই চাদরে ঘুমাতেন, একসঙ্গে গোসল করতেন, উভয়ে উভয়ের মাথা আঁচড়ে দিতেন; বরং এ সময় তিনি স্ত্রীদের ঘরোয়া কাজে বেশি বেশি সহযোগিতা করতেন এবং মানসিকভাবে অতিরিক্ত সাপোর্ট দিতেন।

হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম। আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম, আল্লাহর রাসুল (সা.) ঠিক সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে রাখতাম, নবীজি (সা.) ঠিক সেখানে মুখ লাগিয়ে চিবুতেন, যেখানে আমি চিবিয়ে রেখেছি’ (মুসলিম: ২/৫৯৯; ইবনে মাজা: ১/৬৩৪; মুসনাদে আহমাদঃ১/৩২৭)

নারীরা আজানের জবাব দিতে পারবে। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৩)

ঋতুস্রাবকালে কেউ যদি সিজদার আয়াত শুনে তাহলে তার ওপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস: ৪৩৪৭)

মুখস্থ দোয়া-দরুদ, জিকির-আজকার, তাসবি-ইসতেগফার ইত্যাদি সবই করা যাবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত মামার (রহ.) বলেন, আমি যুহরি (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী নারী এবং যার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে, সে আল্লাহর জিকির

করতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে? তিনি বললেন, না (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ১৩০২) ।

ইবরাহিম নাখায়ি (রহ.) বলেছেন, ঋতুবতী নারী ও যার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে, সে আল্লাহর জিকির করতে পারবে এবং বিসমিল্লাহও পড়তে পারবে। তবে কুরআন পড়তে পারবে না। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ১৩০৫)

ইসলামে নারীর নিরাপত্তা

আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাঁদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন। নারীর নিরাপত্তা বিধানে তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, দিয়েছেন কিছু বিধান। এই বিধান ও নির্দেশনা নারী-পুরুষের স্রষ্টার পক্ষ থেকে, যিনি জানেন তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তি এবং তাদের জীবনের বাস্তব অবস্থাগুলো। একমাত্র ইসলামই নারীকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত।

একজন নারী নিজে ও নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখবে নিজের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ্‌র তরোফ থেকে নির্দেশ। পরপুরুষ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাতে পারবে না। নারীদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ

সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' [সূরা নূর : ৩১]

পর পুরুষের সামনে না যাওয়া ও তাদের সঙ্গে উঠাবসা-চলাফেরা থেকে বিরত থাকাই নারীর জন্য বড় পর্দা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা নারীকে আদেশ করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের।একজন নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং প্রধান কর্মক্ষেত্র তার গৃহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন, '(তরজমা) আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।' [সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,নারী হল সতর তথা আবৃত থাকার বস্তু। নিশ্চয়ই সে যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নিকটে থাকে। [আলমুজামুল আওসাত, তবারানী]

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমাজ হবে আলাদা। নারীর বিশেষ সমাজ শুধু নারীর সঙ্গে গৃহের অভ্যন্তরে বা ও গৃহের বাইরে।নারীর নিরাপত্তার প্রধান বিধান হল পর্দা। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং ইফফাত ও পবিত্রতার একমাত্র উপায়।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করেছেন তাঁর স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে চাদর দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রাখার। পর্দাশীল পুণ্যবতী নারী নিজের বাবা, ভাই, স্বামী এবং সন্তানের জান্নাতের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।

এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব: ৫৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন নারীদেরকে আদেশ করেছেন যখন তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন যেন মাথার উপর থেকে ওড়না/চাদর টেনে স্বীয় মুখমন্ডল আবৃত করে। আর (চলাফেরার সুবিধার্থে) শুধু এক চোখ খোলা রাখে। [ফাতহুল বারী ৮/৫৪, ৭৬, ১১৪]

ইবনে সীরিন বলেন, আমি (বিখ্যাত তাবেয়ী) আবীদা (সালমানী রাহ.)কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কাপড় দ্বারা মাথা ও চেহারা আবৃত করবে এবং এক চোখ খোলা রাখবে।

আল্লাহ্ আরও বলেছেন,

তোমরা তাঁদের (নবী পত্নীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। তোমাদের কারো জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংগত নয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। [সূরা আহযাব: ৫৩]

নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় আল্লাহ্ পুরুষদেরকেও পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষদের আল্লাহ্ নিজের চোখ নিচে নামিয়ে রাখতে বলেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, “হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন” [সুরা আন নূর: ৩০]

এ ব্যাপারে হাদিসে আছে, ওকবা ইবনে আমের জুহানী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলু (সাঃ) ইরশাদ করেন ‘তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসারী সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় সম্পর্কে আপনি কী

বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু।' [সহীহ বুখারী ৯/২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৭২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৭১; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯, ১৫৩]

নারীর নিরাপত্তা তাদের উচিৎ সকল ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া এবং পুরোপুরিভাবে পর্দা মেনে চলার চেষ্টা করা। একমাত্র আল্লাহর বিধানেই রয়েছে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন এবং তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিন্দু ধর্মে নারীর আবস্থান

নারীকে সৃষ্টির জননী রূপে সনাতন হিন্দু ধর্মে চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য শাস্ত্র বলে- "যেখানেনারী প্রীতা থাকেন, সেখানেই সকল দেবতারা বাস করেন- আর যে স্থানে নারী প্রীতা না হন সেখান হতে দেবতারা প্রস্থান করেন।"

সেই একি ধর্মে আবার "নারী নরকের দ্বার" কথার মধ্যেই এই ধর্মের মনোভাব পরিষ্কার ফুটে ওঠে। নারীদের স্বভাবই হল পুরুষদের দূষিত করা। সাধু সাবধান! [মনুসংহিতায় ২/২১৩]

তার ওপর বিবাহকে নারীর জীবনে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু ধর্ম নারী নির্যাতনকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয়ই দিয়েছে। মেয়েদের পালাবার পথ রাখে নি। অনেক নারীরাই মনে করেন এই ধর্মীয় অনুশাসন বস্তুত: তাঁদের পায়ের বেড়ি। হিন্দু সমাজে নারীরা স্বামীর ঘরে অত্যাচারিত হলেও বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভাবাটাই তাদের জন্য কঠিন হয়ে পরে। নির্যাতন থেকে বাঁচতে কোন মহিলা যদি বিচ্ছেদ চান, তাঁর শুধু স্বামী পরিত্যাগের সাহস থাকলেই চলবে না, সমস্ত পূর্ব পরিচয় মুছে ফেলার সাহসও থাকতে হবে। অর্থাৎ বিয়ে ভাঙ্গা শুধু স্বামী সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করাই নয়, আরও একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া। আমাদের সমাজে পারিবারের কর্তার আদেশ মেনে বড় হওয়ার ফলে হিন্দু

মহিলারা নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে অসুবিধে বোধ করেন। তাঁরা অপেক্ষা করেন বাড়ির গুরুজনেরা সমস্যার ব্যাখ্যা শুনে সমাধান করে দেবেন, অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেবেন।

হিন্দু সমাজে পরিবারের সবচেয়ে তুঙ্গে বসেন পারিবারের কর্তাব্যক্তি এবং তাঁর নিচে থাকেন অন্যান্যরা, বিশেষত: মেয়েরা। সামাজিক নিয়ম অনুসারে ছোট বড় সব সিদ্ধান্তের ব্যাপারেই পরিবারের সদস্যদের এই শীর্ষ ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। "কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।"

হিন্দু সমাজে যৌথ পরিবার প্রথায় অভ্যস্ত মহিলারা বলেন, দাদু, কাকা, জ্যাঠা, মা-বাবা, বা গুরুর মতামত ছাড়া তিনি এক পাও এগোতে পরবেন না, সে যতো জরুরী পরিস্থিতিই হোক না কেন। সংস্কৃতিগত অনুশাসনে ভেতরের ও বাইরের লোকের পার্থক্য নির্যাতিত মহিলাদের জীবনে এক বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে। আত্মীয় স্বজনের অভাবে অভিবাসী সমাজে এই সমস্যা আরও জোরদার হয়ে দাঁড়ায়। বহু অত্যাচার সহ্য করেও মহিলারা আত্মীয়ের বাইরে কারোর কাছে সাহায্য চাইতে পারেন না।

হিন্দু সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা একেবারেই বিপরীতধর্মী। ধরে নেওয়া হয় নারী সংসারের ভেতরের কাজ সারবে আর পুরুষ করবে বাইরের কাজ। স্বভূমিতে দুজনকেই ক্ষমতাশীল মনে করা হলেও প্রকৃতক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান হয় পুরুষের নিচে।

হিন্দু ধর্মে নারী পুরুষ সমান সমান, কোন পক্ষপাতের প্রশ্নই ওঠে না। তবে রামায়ণ ও মহাভারতে নিশ্চয়ই নারীদের বিশেষ সম্মান দেয়া হয়েছে।তবে আল্লাহ্ স্পষ্ট বলেছেন আল্লাহ্র সৃষ্ট নারী পুরুষের সমান সমান মর্যাদা।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' [সূরা বনী-ইসরাঈলঃ আয়াতের অংশ ৭০]

হিন্দু ধর্মে একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর অবস্থা

হিন্দু ধর্মের নির্দেশ অনুসারে স্বামীর অবস্থান স্ত্রীর উর্ধ্বে। স্ত্রীর পরম গুরু হল স্বামী। এমনকি স্ত্রীকে শাসন করা বা শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অধিকারও স্বামীর আছে। বেশীর ভাগ মহিলারাই পুরুষের এই সুউচ্চ ভূমিকা স্বীকার করে নেন। ফলে নেহাতই অপারগ না হলে স্বামীর বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ তাঁরা করেন না। এমনকি অনেকেই স্বামীর কর্তৃত্ব ও অত্যাচার স্বাভাবিক বলেই মনে করেন।

কিভাবে একজন স্বামী স্ত্রী ভাই বোন হতে পার? নাউজুবিল্লাহ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন - "একটি দুটি সন্তান হবার পর স্বামী স্ত্রী ভাই বোনের মতো থাকবে।" অথচ এটা নাকি পরিবার পরিকল্পনার ইঙ্গিত । এসব দেখিয়ে নারী পুরুষকে বিয়ের পরেও ভাইবোন মানতে বলা হয়েছে ।

হিন্দু পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নারী নির্যাতনের বীজ। যৌথ পরিবারে নববিবাহিতা স্ত্রীর সামাজিক পদ হয় সবচেয়ে নিচে। তার চলাফেরা, আসা যাওয়া, খাওয়া দাওয়া, ব্যবহার, নিয়ম নীতি সবই নির্ধারণ করে শ্বশুরবাড়ির গুরুজনেরা। এত বিধিনিষেধের ফলে নারীর জীবনে বাড়ে সীমাবদ্ধতা।

নারী নির্যাতনের মূলে রয়েছে নারী পুরুষের অসম ভূমিকা ও পৌরুষের অধিকার, যে পৌরুষ প্রকাশিত হয় নারীর উপর আধিপত্য স্থাপন করে। দাম্পত্য সম্পর্কে নারী শক্তিশালী হলে, নিজের মতামত সোচ্চারে প্রকাশ করলে, সমাজে পুরুষের নিন্দে হয়। তার উপাধি হয় 'মেনীমুখো।' এছাড়া তার কপালে জোটে 'ভীতু,' 'বৌয়ের আঁচল ধরা,' ইত্যাদি আখ্যা। আত্মীয় স্বজন বাড়ীর ছেলেদের উপদেশ দেন বৌকে বুড়ো আঙুলের চাপে রাখতে, 'বিয়ের পয়লা রাতে বেড়াল মারতে।'পুরুষের আদর এবং তার বিপ্রতীপ, নারীর প্রতি বিরাগের বাস্তব প্রকাশ হল আজকের সমাজে কন্যা ভ্রূণ ও কন্যা শিশু হত্যার প্রসার। “বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।

পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম।" [মনুসংহিতায় ৫/১৪৮] নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রদের অধীন; কখনও স্বাধীনভাবে থাকবেন না।

পতি দুশ্চরিত্র, কামুক বা গুণহীন হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী 'র কাছে সর্বদা দেবতার মত সেবা পাওয়ার যোগ্য। [মনুসংহিতায় ৫/১৫৪] বোঝাই যাচ্ছে কেন সতী অনুসূয়া কুষ্ঠরোগী স্বামীর ইচ্ছে মেটাতে তাকে কাঁধে করে বেশ্যাবাড়ি নিয়ে গেছলেন; সে রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানটিকে পুরুষের কাপুরুষতার চরম উদাহরণ বলে যতই গালমন্দ করুন না কেন!

স্ত্রীলোকের আলাদা কোন যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই। তিনি যে পতিসেবা করেন তাতেই স্বর্গে পূজো পাওয়ার যোগ্য হন। [মনুসংহিতায় ৫/১৫৫]

ধর্মজনিত বহু রকমের প্রতিবন্ধক অত্যাচারিত মহিলাদের জীবনে বাধা সৃষ্টি করলেও সবচেয়ে বড় বাধা হয় কর্ম সম্পর্কে মহিলাদের এই ধারনা। বহু মহিলা অত্যাচারের মুখে হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, এ হল পূর্বজন্মের কর্মফল। তাঁদের মতে এই কর্মফল তাঁদের যখন ভোগ করতেই হবে, আপত্তি করে লাভ কি! মেনে নেওয়াই ভাল।

হিন্দু ধর্মে একজন নারীর ৮ প্রকার বিবাহ বিধির কথা বলা হয়েছে ।আ ৮ প্রকার বিবাহ বিধিগুল হল,

হিন্দুধর্মে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য গতানুগতিক শারীরিক মিলনের রীতি অনুসরণ করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দু বিবাহ শারীরিক মিলন ব্যতীত সম্পূর্ণ ও বৈধ হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ এটি শারীরিক মিলনের ঊর্ধ্বে দুটি আত্মার আত্মিক মিলন।

ব্রহ্ম— কন্যাকে এখানে সর্বোচ্চ মানা হয়। বধূকে অনেক উপহার সামগ্রী (পণ নয়, স্ত্রীকে উপহার হিসেব) দিয়ে বিয়ে করতে হয়। সমান বর্ণে হয়। কন্যার পিতা ছেলের যোগ্যতা যাচাই করতে পারবে। শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

দৈব— বৃহৎ যজ্ঞের দান হিসেবে কন্যাকে দেওয়া হতো। অধিকতর ক্ষেত্রে এই বিবাহ সেই কন্যাদের দেওয়া হত যাদের বিবাহ হচ্ছে না। এবং তাতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেওয়া হতো।

আর্ষ— কন্যার পিতা কন্যা দিতে বাধ্য,কারণ মূলত ঋষিরাই বিবাহের আশা করত এবং কিছু গরুর বদলে কন্যা নেওয়া হতো। গরু দান রূপে কন্যার মূল্যই দিতে হত। বলা যায়। যেমন—ঋষি অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার বিবাহ।

প্রজাপত্য— এটাই সর্বাধিক প্রচলিত বিবাহ বিধি। বেদে এরই প্রচলন দেখা যায়। এতে যোগ্য বর-বধূরই বিবাহ হয়। কোন প্রকার লেনদেন নেই। যজ্ঞ দ্বারা বিবাহ হবে। প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রবর্তিত বিবাহ বিধি। তাই এই ক্ষেত্রে সব কাজে দেব প্রজাপতির স্মরণ করা হয়। এবং এতে দুজন একে অন্যের ভালো থাকার দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ বিধি।

গান্ধর্ব— এতে মালা বদলে বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়েগুলো এভাবেই হতো। যেমন— দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা।

অসুর— ধনী ব্যক্তির একজন দরিদ্র নারীকে বিবাহ করার বিধি এটি। এতে কন্যার পরিবারকে অনেক সম্পদ দেওয়া হয়। বিশেষত বর এক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে স্ত্রী হতে যোগ্যতায় নিচ হয়।

রাক্ষস— কন্যাকে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে বিবাহ করা। কিছুটা পালিয়ে বিয়ে করার মতোই। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ।

পিশাচ— একজন ঘুমন্ত, মানসিক ভাবি ব্যথিত বা মাতাল অবস্থার কোন নারীকে, মাতাল অবস্থায় বা কোন প্রকারে ধর্ষণ করলে, সমাজের কোন পুরুষ তাকে গ্রহণ করে না। তখন সেই নারীকে ধর্ষণকর্তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার বিধিকে বলে পিশাচ বিবাহ।

বৈদিক বিবাহ ছিল হিন্দু বিবাহ রীতিনীতিগুলির কয়েকটি ভিন্ন ধরনের কিন্তু প্রেমের বিবাহ ঐতিহাসিক হিন্দু সাহিত্যেও দেখা গিয়েছিল এবং বিভিন্ন নামে যেমন গন্ধর্ব বিভা নামে বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু দরিদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলিতে এখনও কাঁথি-বাদল নামে প্রচলিত রীতি রয়েছে যা কৃষ্ণা প্রতিমার সামনে একাকীত্বের একান্ত সরল রূপ হিসাবে পুঁতির মালা বিনিময়, গ্রহণযোগ্য প্রেম বিবাহের এক রূপ হিসাবে বিবেচিত। যেখানে ব্যাভিচারিতা ইসলামে জঘন্য অপরাদ সেখানে হিন্দু ধর্মে এর প্রচলন রয়েছে গন্ধর্ব

বিবাহে। হিন্দুমতে একজন মেয়ের এবং তাঁর প্রেমিকের স্বেচ্ছাসেবী মিলনকে যখন 'প্রেম' বিবাহের কথা আসে তখন এটি গন্ধর্ব বিবাহই সর্বাধিক মিল। এখানেই একজন বর এবং তার কনে তাদের পিতামাতার জ্ঞান বা অনুমোদন ছাড়াই বিবাহ করতে পারে।

অতীতে বাঙালি হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনেক উচ্চ হিন্দু বংশেতো মেয়ে বাচ্চা হওয়ার পর পরি তাদের বিয়ে ঠিক করে রাখে, এমনকি বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিয়ে করিয়ে দেয়। বর্তমানে বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ তথা দণ্ডনীয় অপরাধ। বর্তমানে পরিণত বয়সেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। তবে, বিবাহে পণপ্রথা এখনও বহুল প্রচলিত।

হিন্দু ধর্মে মায়ের অবস্থান

হিন্দু ধর্মে মায়ের স্থান অনেক উঁচু ।চণ্ডীতে স্তব মন্ত্রে বলা হয়েছে

“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” ।

আর সন্তান এর কাছে মায়ের স্থান কোথায় হবে সে বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে । সে বিষয়ে জানতে আমরা মনু সংহিত্র একটি শ্লোক দেখব-

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যণাং শতং পিতা ।

সহস্রন্ত পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে । [মনুসংহিতা, ২/১৪৫]

অনুবাদঃ

দশজন উপাধ্যায় থেকে একজন আচার্যের গৌরব বেশি । একশত আচার্যের থেকে পিতার গৌরব বেশি এবং সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা সম্মানার্হা ।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে গর্ভধারিনী মাতাই আমাদের একমাত্র মাতা নয়। উনি ছাড়াও আরও ৬ জন কে মাতার স্থান দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৭ সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী মেয়েরা কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়। তবে বিধবা হওয়ার পর সন্তান নাবালক থাকা অবস্থায় শুধু বসতি বাড়ির অধিকারী হয়

ইসলাম ধর্মে বলা আছে বাবা মারা গেলে মায়ের দায়িত্ব ছেলে নিবে কিন্তু হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে বিধবার দায়িত্ব কেবল তার নিজের।মায়ের সেবা করার পূর্ণাঙ্গ কোনো বিধান মনুসংহিতা তে নাই

হিন্দু ধর্মে ঋতুবতী নারীর অবস্থান

হিন্দু ধর্মে ঋতুবতী নারী বলতে বোঝায়, অতীতে নিজের কাধে ইন্দ্রের পাপ তুলে নেওয়ার কারণেই নারীরা রজস্বলা হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে লিখিত রয়েছে।

ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তাতে সবাই তাকে ব্রহ্মহত্যাকারী ডাকতে থাকে। তাই সে কৌশল করে তার পাপের এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোকদের দিয়ে দেয়। স্ত্রীলোকেরা সেটা গ্রহণকরে গর্ভের উপদ্রব বাদে বাকি সময়টা পুরুষসঙ্গ লাভের শর্তে। এখন মেয়েরা ঋতুবতী হলে সেই অবস্থায় তাদের সেই পাপ প্রকাশ পায়, সে সময় তারা তাদের শরীরে তেল দিতে পারবে না, তাদের স্পর্শ করা খাবার ইন্য কেউ খেতে পারবে না।

'স্ত্রীলোকেরা রজস্বলাকালীন সে পাপের প্রকাশ পায়, সে সময় তারা তৈলাদি গ্রহণ বা শরীরের অভ্যঞ্জন প্রভৃতি করবে না, তৎস্পৃষ্ট অন্নাদি কেউ গ্রহণ করবে না। প্রসঙ্গক্রমে রজস্বলার ব্রত বলছেন,যে মলবাসযুক্ত রমণীর সম্ভাষণ করবে, সে মিথ্যা অপবাদযুক্ত, সভাতে লজ্জিত, মরণশীল ও কুষ্ঠরোগযুক্ত হয়।'

এমনকি মাসিক অবস্থায় নারীরা কোনো খাবার স্পর্শ করলে (সেটা রান্নার সময়ই হোক না কেন) সেই খাবার খাওয়া নিষেধ। খেয়ে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

অত্রিসংহিতায় আছে,

'অজ্ঞানতঃ অন্ত্যজ বা রজস্বলা-স্পৃষ্ট পকান্ন ভোজন করিলে । প্রাজাপত্যার্ধ করিবে। চাণ্ডালান্ন-ভোজী চতুর্ব্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি, যথাঃ ব্রাক্ষণ — চান্দ্রায়ণ; ক্ষত্রিয় — সান্তপন; বৈশ্য — ষড়রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য-ভোজন; এবং শূদ্র — ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যথকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।

দয়ানন্দ সরস্বতী অথঃ সংস্কারবিধি গ্রন্থে এই কথা বলেছেন,

'রাজস্বলা স্ত্রী ছোঁওয়া জলও পান করিবেনা। রাজস্বলা স্ত্রী কোন কাজকর্ম ও করিবে না, কেবল নিজ্জনে বসিয়া থাকিবে। এই চারি রাত্রিতে সমাগম করা নিরর্থক ও মহারোগোৎ পাদক। যেমন ফোড়া হইতে পূজ রক্ত বের হয়। স্ত্রীর শরীর হতেসেই রূপ। রাজ একপ্রকার বিকৃত। উষ্ণ রক্ত নির্গত। হইতে থাকে।'

হিন্দু ধর্মে একজন ঋতুবতী নারী যদি কোনো খাবার দেখে, সেটাও খাওয়া যাবে না। খেয়ে ফেললে তিন রাত্র গোমূত্র ও যাবক খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

শাতাতপসংহিতায় এসেছে,

'রজস্বলা স্ত্রী কর্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র ও যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে।'

আমরা জানি, হিন্দুধর্মে সাধারণভাবেই স্ত্রীর সাথে একসাথে বসে খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে ঋষি পরাশর ঋতুবতী নারীদেরও আলাদা করে উল্লেখ করেছেনঃ

'রজোযুক্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। এবং তাহার সহিত ভোজন করিবে না।'

নারী জাতি কতবেশি অসহায় হলে মাসিক অবস্থায় তাদের এমন করুণ অবস্থা হয়। মাসিক অবস্থায় নারীদের স্পর্শে অপবিত্র হওয়া ব্যক্তির জন্য তিন রাত উপোস, শুদ্ধির জন্য স্নান, প্রাজপত্য ব্রতের বিধান এসেছে!

এ ব্যাপারে সংবর্ত্তসংহিতায় এসেছে,' চাণ্ডাল, পতিত, মৃতদেহ, অন্যান্য অন্ত্যজজাতি, রজস্বলা স্ত্রী এবং সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কাপড়সহ গোসল করে শুদ্ধ হতে হবে। এরা এমনই অশুদ্ধ!'

এ কেমন জীবন বিধান যেখানে মাসিক অবস্থায় একজন নারীকে সবসময় পরিষ্কার থাকা উত্তম শেখানে হিন্দু ধর্মে গোসল, পায়খানা, হাসা, কাঁদা সব নিষেধ ঋতুবতী নারীদের জন্য।

হিন্দু ঋতুবতী নারী যা যা করতে পারবে নাঃ

১. অঞ্জন পারবে না (চোখের প্রসাদনী – সুরমা/কাজল)

২. স্নান করতে পারবে না, জলে নামতে পারবে না।

৩. খাটে শুতে পারবে না, মাটিতে শুতে হবে।

৪. দিনের বেলায় কোনো ঘুম নেই তাদের, যদিও আমরা জানি এ সময় তারা যন্ত্রণাময় অবস্থা অতিক্রম করে।

৫. অগ্নি-স্পর্শ করবে না। মানে রান্না-বান্নার কাজেও যুক্ত হতে পারবে না।

৬. দাঁত মাজতে পারবে না।

৭. আকাশের দিকে তাকিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে পারবে না।

৮. মাংস খেতে পারবে না । (অন্যসময় খেতে পারবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে)

৯. হাসতে পারবে না।

১০. কোনো কাজ করবে না।

১১. দু'হাত আঁজলা করে পানি পান করতে পারবে না।

১২. কাঁসা, তামা ও লোহানির্মিত পাত্রে জলপান করতে পারবে না।

১৩. শরীরে তেল মাখতে পারবে না। (অভ্যঙ্গ)

১৪. তাদের সম্ভাষণ করা যাবে না।

১৫. শৌচকর্ম করতে পারবে না। ন্যুনতম তিনদিন যাবৎ এই কষ্ট তাদের সহ্য করতে হবে।

১৬. গান গাইতে পারবে না।

১৭. কান্না করতে পারবে না। এতগুলো অবিচার পাওয়ার পরেও!

১৮. যাতায়াত করতে পারবে না। কোনো যান ব্যবহার করতে পারবে না।

১৯. অনু-লেপন করতে পারবে না। যেমনঃ শরীরে ক্রিম লাগানো, চন্দন লাগানো।

২০. যৌনসহবাস করতে পারবে না। এই টুকু যৌক্তিক শুধু।

২১. দেবতার্চ্চন করতে পারবে না।

২২. কাউকে নমস্কার করতে পারবে ন।

২৩. অন্য রজস্বলা স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে পারবে না, বস্ত্রও ছুঁতে পারবে না।

এমনকি একজন নারী যখন প্রথম মাসিক শুরু হয় তখন নাকি ঐ অবিবাহিত মেয়েকে হরণ বৈধ, এক কথায় যা খুশি করতে পারবে হিন্দ ধর্মে।

এব্যাপারে হিন্দুধর্মের অন্যতম আইনশাস্ত্র বিষ্ণুসংহিতায় এসেছে,' তিনবার ঋতুদর্শন-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কন্যা স্বয়ংবর করিবে। কেননা তিনবার ঋতু দর্শন, হইয়া গেলে কন্যা আপনার উপর প্রভুত্বসম্পন্ন হয়। যে কন্যা অবিবাহিতা-অবস্থায় পিতৃগৃহে রজোঃ-দর্শন করে, সেই কণ্ঠা বৃষলী বলিয়া জ্ঞাতব্যা। তাহাকে হরণ করিলে দোষী হইতে হয় না।

সোজা কথায়, কন্যাকে ঋতুবতী হওয়ার আগেই বিবাহ দিতে হবে। অবিবাহিত অবস্থায় পিত্রালয়ে ঋতুবতী হয়ে গেলে তাকে যে কেউ হরণ করতে পারবে। প্রথম তিন ঋতুর মধ্যেও তাকে বিবাহ না দেওয়া হলে সে নিজেই নিজেই বিয়ে করে নেবে।

হিন্দু ধর্মে বিধবা নারীর অবস্থা

কেড়ে নেওয়া হতো মনের প্রফুল্লতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর সতন্ত্রতা কেড়ে নিয়েছে কৌশল। নারী শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে জন্ম হতেই করেছে পরাধীন। এই ভয় হিন্দু ধর্মে নারীকে রূপান্তরিত করেছে দাসীতে। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা নারীকে পুনঃ বিবাহ করার স্বীকৃত বা অনুমোদন ছিলনা। নরদেবতা বা দুষ্ট ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিয়মের কারণে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিল।

এককালে স্বামীর মৃত্যুর পর কমবয়সী বিধবাদের তাঁদের বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হত।পতিগৃহে সাধারণভাবে তাঁদের স্থান ছিল না। সিঁথির সিঁদুর মুছে, দেহের সব অলঙ্কার খুলে ফেলে, চুল কেটে, সাদা থান পরে, এক বেলা নিরামিষ খেয়ে অনশন-ক্লিষ্ট অবস্থায় তাঁদের বৈধব্য পালন করতে হত। কারণ ছিল বিধবা নারীর যৌবন, দীর্ঘ কেশ ও রঙিন শাড়ী-গয়নায় পুরুষরা আকৃষ্ট হয় - তাই এই ব্যবস্থা।

বিধবা নারীর নিজের মধ্যেও যেন কামনার উদ্রেক না হয়, তার জন্য শুধু আমিষ বর্জন নয়, অনেক জায়গাতে মুসুর ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপারেও বাধানিষেধ ছিল, কারণ এগুলি এবং আমিষকে মনে করা হত কামোত্তেজক খাদ্য! বাপের বাড়িতে ভাইদের সংসারেও বিধবাদের স্থান উচ্চে ছিল না। বাড়ির সব কাজ তাঁদের দিয়েই করানো হত। বিধবাদের পুনর্বিবাহ কল্পনা করাও ছিল পাপ। বিধবারা সংসারের কাজ করে শুদ্ধমনে পবিত্র জীবনযাপন করবে এইটেই ছিল সমাজের দাবী। স্বামী মারা যাওয়ার পরে বিশেষ করে যখন কোনও কাজে বাইরে বের হতো সেটাই সবথেকে কাল হয়ে যেত তাদের জন্য। পোশাক পরিচ্ছদ বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে পুরুষ মানুষদের কটু চোখের দৃষ্টি এড়ানো সবই সহ্য করতে হয় নারীদের।

কোনও অনুষ্ঠান বা শুভ কাজে বিধবার উপস্থিতি সবাইকে অসস্থিতে ফেলে দিত, সেখানে গিয়ে কথা শুনতে হতো যে বিধবারা ওরকম অনুষ্ঠানে গেলে ওই পরিবারটির

কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কপালে টিপ পরা, সাজগোজ করা, গলায় হার পরা, ভাল ভাল রঙিন শাড়ি পরা এসবই তো নিষিদ্ধ ছিল হিন্দু সমাজে।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দু সমাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বিধবাদের পুনরায় বিবাহের অনুমোদন দেয় নি। বিধবারা এমনকি যারা শৈশবে বা কৈশোরে বিধবা হয়েছিলেন তারাও বৈরাগ্য ও কঠোর ত্যাগ স্বীকার করে জীবনযাপন করবেন এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। তাদের ধারণা মতে পরিবারের সম্মান ও পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এরকম নিয়ম করা হয়েছিল।

হিন্দু আইনে একজন মেয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনঃবিবাহের আইন নেই। তথাকথিত শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রগতিশীল কিছু হিন্দু লোকেদের মতে 'হিন্দু বিয়ে জন্মজন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। হিন্দু বিয়ে ভাঙা সম্ভব নয়। মেয়েদের পুনরায় বিয়ে হতে পারে না।'

সতীদাহ প্রথা হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো সদ্য বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় সহমরণ বা আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করার এক অমানবিক প্রথা। 'সতী'শব্দটি এসেছে দেবী সতীর নাম থেকে। রাজা দক্ষের কন্যা ও দেবতা শিবের স্ত্রী তিনি। রাজা দক্ষ সতীর সামনে শিবকে তিরস্কার করলে স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেতে তিনি আত্মাহুতি দেন। তা ছাড়া মহাভারতে পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহমরণে গিয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪ শতকে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আগমনের বিবরণে সতীদাহ প্রথার সন্ধান মেলে।হিন্দু ধর্মগুরুরা এসব পৌরাণিক কাহিনি ব্যবহার করেছেন সতীদাহ প্রথার নামে নারী হত্যার ক্ষেত্র তৈরিতে। শত শত বছর ধরে চলে আসা এই নৃশংসতম প্রথা।

সতীদাহ প্রথা ছিল মূলত সামাজিক ও ধর্মীয় হত্যাকাণ্ড। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দখল নিতে এবং পারিবারিক মানসম্মান নষ্ট হওয়ার ভয় থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা সদ্য বিধবা হওয়া নারীকে জোর করে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারতেন। তা ছাড়া ছেলে মারা যাওয়ায় তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে রাখা ঝামেলা মনে করা হতো। হত্যাই যেন এর সহজ ও একমাত্র সমাধান ছিল।

জোর করে বিধবাকে চিতায় তোলার সময় তাঁর কান্নার আওয়াজকে চাপা দিতে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘণ্টার আওয়াজ তুলত। বিধবা নারীকে নববধূর মতো সাজিয়ে, সিঁদুর ও ফুলের মালা পরিয়ে, চন্দন ও আলতার রঙে রাঙিয়ে জ্বলন্ত চিতার ওপর তুলে দেওয়া হতো। অনেক সময় আফিমজাতীয় মাদকদ্রব্য খাইয়ে বা মাথার পেছনে আঘাত করে অজ্ঞান করে হাত-পা বেঁধে স্বামীর চিতায় তুলে ভস্ম করে দেওয়া হতো। চিতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে আঘাত করা হতো এবং ঠেলে দেওয়া হতো আগুনের ভেতর। এতোটাই যাযাবর ছিল উচ্চ-বর্ণের হিন্দু সমাজ।

রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা বিলুপ্ত করার উদ্যোগ নেন।ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথাকে আইন করে তুলে দেওয়া হয়। সেই সময় বেঙ্গলের গভর্নর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক।

এ আইনি কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল মূলত রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলনের জন্যই। পরবর্তী সময়ে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে হিন্দু সনাতনপন্থীরা লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে মামলা করেছিলেন। তবে প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ সালে বাংলার শাসক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের ১৮২৯-এর আদেশই বহাল রাখে।

এই বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে ‘রাজা’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর ভারতবর্ষ থেকে সতীদাহ প্রথা পুরোপুরি বন্ধ করতে আরও তিন দশক লেগে যায়।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর উপস্থিতিতে প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

এখনো ভারতীয় সমাজের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া প্রায় সব রাজ্যেই বিধবাদের পুনর্বিবাহ চালু আছে।

যৌতুক প্রথা

`Dowry': The Property that a wife or a wifes family give to her husband upon marriage. যৌতুক হল বিবাহ উপলক্ষে কন্যা বা কন্যার পরিবারের পক্ষ থেকে বরকে প্রদেয় সম্পদ। (The New Encyclopedia Britannica V. 4, P. 205)

প্রাচীন হিন্দুসমাজে এর উৎপত্তি হয়েছে, এটি প্রায় স্বীকৃত।হিন্দু আইনে যৌতুককে নারীর সম্পত্তির উৎস বলা হয়। এতে তার নিরঙ্কুশ অধিকার স্বীকৃত। হিন্দু সমাজে নারীরা পুরুষদের মতো একই ভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো না। তাই অনেক আগে থেকেই হিন্দু সমাজে নারীদেরকে বিয়ের সময়ে যৌতুক দেবার প্রচলন ছিল।

উল্লেখ্য, হিন্দুদের এই কন্যাপণের সাথে ইসলামের মোহরের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, কন্যাপণ দেওয়া হত ক্ষতিপূরণের জন্য কন্যার পরিবারকে, কন্যাকে নয়। আর মোহর দেওয়া হয় কন্যার সম্মানি হিসাবে স্বয়ং কন্যাকে, কন্যার পরিবারকে নয়।

কালক্রমে তা বিয়ের পণ হিসাবে আবির্ভূত হয় যা একসময় কনে পক্ষের জন্য এক কষ্টকর রীতি হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে যৌতুক হলো একটি কঠিন সামাজিক রোগ। আমাদের সমাজে গরীব-ধনী সব পরিবারেই যৌতুক প্রথা বিদ্যমান। যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। গ্রাম- শহর সব জায়গাতেই স্ত্রীরা স্বামীদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, কখনো কখনো মারাও যাচ্ছে। একাধিক সন্তানসহ নারীকে প্রায়ঃশই ঘর সংসার হারাতে হয় যৌতুকের কারণে।

প্রাচীনকালে অনার্যরা সমাজে মর্যাদা পাওয়ার আশায় আর্যদের নিকট তাদের কন্যা সম্পাদন করত। বিনিময়ে মোটা অংকের সম্পদ দিত। তখন থেকেই যৌতুক প্রথা কালক্রমে একটি সামাজিক রূপ নেয়।

হিন্দুসমাজের এই শ্রেণীবৈষম্য বা কুলিনত্বের কারণে হিন্দুসমাজে আজো যৌতুক প্রথা বেশি। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাঝে এর প্রচলন অনেক। উনবিংশ শতাব্দিতে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের বাহ্মণরা প্রচুর যৌতুক পাওয়ার আশায় শতাধিক বিবাহ করত। এসব স্ত্রী তাদের পিতৃগৃহেই থাকত। স্বামীরা বছরে একবার দেখা করতে আসত এবং প্রচুর আতিথেয়তা ভোগ করে যাওয়ার সময় অনেক যৌতুক নিয়ে যেত।

যৌতুকের নতুন সংযোজন হয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও কুলিনত্বের মর্যাদা লাভ করে। তখন হিন্দুসমাজে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রী অর্জন করে। এতে চাকুরির বাজারে তাদের দাম বেড়ে যায় এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তখন কন্যাপক্ষ বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বরপক্ষকে আকর্ষণের চেষ্টা করত। তাদের উপহারের মান ও পরিমাণের উপর নির্ভর করত পাত্রের পিতা-মাতার সন্তুষ্টি। এককথায় এটি দাবি করে নেওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। হিন্দু সমাজে নারীর স্ত্রীধন বলতে বুঝায়, যাতে তার স্বত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়ের দান এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল যৌতুক। [হিন্দু আইন, পৃ. ৫৮-৬৯]

হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীরা কোন স্ত্রীধন (যে সম্পদে নারীর স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়) পায় না। তাই বিয়ের সময় যৌতুক দেওয়ার নামে তাদের স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। [হিন্দু আইন, পৃ. ৫৮-৬] এটিই পরবর্তীতে বর্তমান সর্বগ্রাসী যৌতুকের রূপ লাভ করেছে।যৌতুকের ভয়াবহতা এতো বেশিযে বারবার আইন করেও যৌতুক বন্ধ করা যাচ্ছে না। নারীজীবনে এ প্রথা অভিশাপস্বরূপ।

যৌতুক একটি নিপীড়নমূলক রেওয়াজ। এখানে কনেপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে তার পরিবার থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হয়। এটা শুধু জুলুম নয়, অনেক বড় জুলুম। আর তা শুধু ব্যক্তির উপর নয়, গোটা পরিবার ও বংশের উপর জুলুম। অথচ আল্লাহতায়ালা কাউকে জুলুম করে সম্পদ আহরণ নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না।’ [সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৮]

মোটকথা, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন রীতিই বর্তমান ভয়াবহ যৌতুক প্রথার উৎপত্তির মূল কারণ। প্রাচীন মুসলিম সামজে যৌতুকের কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইসলাম ধর্মে বিধানগতভাবেই নারীরা পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, তা সত্ত্বেও কালক্রমে মুসলিম সমাজে এই অভিশপ্ত প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তার রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি আর স্বকীয়তা। দীর্ঘদিন যাবৎ হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজ একত্রে বসবাসের কারণে সাম্প্রতিককালে আরো বিভিন্ন কুপ্রথার মতো এই যৌতুক কুপ্রথাটিও মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হয়। [ইসলামের বৈধ ও নৈতিক প্রেক্ষাপট, তমিজুল হক, ব্যরিস্টার এট ল. পৃ. ৫২৮]

তাই তো ইসলাম ধর্মে ভিন্ন সংস্কৃতি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং কঠোর হুশিয়ারী বার্তাও প্রদান করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।’ [আবু দাউদ, হাদিস ৪০৩১]

হিন্দু ধর্মে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

হিন্দু মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে অধিকার নেই। হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীদের পিতার সম্পত্তিতে যেমন অধিকার নেই, তেমনি স্বামীর সম্পত্তিতেও তারা অধিকার পান না।তবে হিন্দু সংস্কারক ধর্ম গুরুরা এমন কোনো শ্লোক পেতে ব্যার্থ হয়েছেন যেটা দ্বারা প্রমান হয় যে পিতার সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার রয়েছে।

হিন্দু বিধবা নারীদের স্বামী মারা যাওয়ার পর হিন্দু নারীদের বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কোনভাবে বেঁচে থাকতে হয়।নারীরা সম্পত্তির কোন অধিকার পাই না। একেবারে বঞ্চিত। স্বামীর সম্পত্তির অধিকার নাই। বাবার সম্পত্তিতেতো কোন অধিকারই নাই।"

'Woman are powerless, have no inheritance' নারীরা ক্ষমতাহীন,তাদের কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নেই।" [কৃষ্ণযজুর্বেদ ৬:৫:৮:১-২]

একটা মেয়ে যখন বিধবা হয় তার ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও, তাদের কিন্তু দূর্বিষহ জীবন।যেহেতু স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পায় না। মেয়েটাকে বাপের বাড়িতে চলে আসতে হয় সেখানেও তার সম্পত্তির অধিকার নাই।ভায়ের বাড়িতেও কোন মূল্য নেই।

হিন্দু-আইনের মিতাক্ষারা ও দায়ভাগ উভয় মতবাদের আলোকেই সাধারণত কন্যা পিতার সম্পত্তি পায় না। বিশেষ করে দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী সম্পত্তিতে বিবাহিতা কন্যার অংশিদারত্ব অনেকটাই অনিশ্চিত। একে যৌতুক প্রথার উৎপত্তির একটি মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। হিন্দু আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বা বিধবা থাকতে কন্যা পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ লাভ করতে পারে না এবং অবিবাহিতা কন্যা বিবাহিতা কন্যার উপর প্রাধান্য পায়। কন্যা কখনো এই সম্পত্তি পেলে তা শুধু ভোগের অধিকার থাকে। তাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

[হিন্দু আইন, পৃ. ৩৫]

পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিকে নারীর মূল সম্পত্তি বা স্ত্রীধন বলা হয় না। হিন্দুসমাজে নারীরা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দিক থেকে নির্যাতিত। উত্তরাধিকারের বিষয়েও তারা

চরমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। বৌদ্ধায়নের শাস্ত্রে লেখা আছে, স্ত্রী লোকেরা বুদ্ধিহীন, তাহাদের কোন বিচারশক্তি নাই, তাহারা উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য। [হিন্দু আইন, পৃ. ৫১]

স্ত্রী, পুত্র ও দাস — এই তিনজনই ধনহীন থাকবে। এরা যদি কিছু উপার্জন করে তাহলে সেটা তাদের মালিকেরই সম্পত্তি হয়ে যাবে। সাধু সাবধান (৮/৪১৬)

আরো লক্ষণীয় হল, হিন্দু আইনে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অংশগ্রহণ প্রায় অনিশ্চিত। কারণ পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্রের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে বিধবা তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুই পায় না। ওরা না থাকলে যদি কখনো পায় তবে তা শুধু ভোগস্বত্ব। এজন্য বিধবার মৃত্যুর পর স্বামী থেকে প্রাপ্ত সম্পদে তার পরবর্তী ওয়ারিসরা উত্তরাধিকার না হয়ে তার মৃত স্বামীর ওয়ারিশরা উত্তরাধিকার হয়। [হিন্দু আইন, পৃ. ৩৪]

হিন্দু ধর্মে দেবদাসী প্রথা

দেবদাসীর আক্ষরিক অর্থ দেবতার দাসী। বিস্তৃত অর্থে মন্দিরের যৌনদাসী, ধর্মীয় পতিতা। মন্দিরের নাচ-গান করা, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, পুরোহিতদের যৌন চাহিদা মেটানো এসবকিছুই ছিলো দেবদাসীদের কাজ। ভারতীয় প্রথা অনুসারে সুন্দরী যুবতী মেয়ে কিংবা শিশু মেয়েদের দেবতার সাথে 'বিয়ে দেওয়া'কিংবা 'উৎসর্গ' করে দেওয়া হতো। প্রাচীন বিশ্বে অনেক জায়গাতেই এই প্রথা বিভিন্নভাবে চালু ছিলো। ব্যবলীয়নীয়রা প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে মেয়েদের ধরে নিয়ে যেতো, সেখানে অপরিচিত পুরুষের সাথে তাদের শুতে হতো। আর্যরা এই প্রথা শুরু করেছিলো একসময়, এবং ব্রাহ্মণরা এই প্রথাকে একদম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

রোমান সমাজে দেবদাসী প্রথা ছিল, তবে তাদেরকে দেব নর্তকী বলা হতো। রোমে জিউস, জুনো এবং ভেনাসের মন্দিরে দেব নর্তকী ছিল বলে জানা যায়।

মধ্যযুগে হিন্দু মন্দিরগুলোতে দেবদাসী প্রথা বেশি প্রচলিত হওয়ার কারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করতো এতে তাদের জন্য মন্দিরের মতো স্বর্গ তৈরি হবে এবং দেবদাসীরা স্বর্গের অপ্সরা তুল্য।

"Every Hindu temple aims at being an earthly reproduction of the paradise of the god in whose honour it was built.... The Gandharvas are represented by the Temple-band, the Apsaras by the courtesans who sing and dance in the service. These are dedicated to the service of the god; they also give their favours to his worshippers. They are usually called Devadasis" [Modern Religious Movements in India, page 408-9]

When these young girls have reached the age of eleven or twelve years their mistresses take them to this pagoda, as thay believe that it will be good fortune to be offered and abandoned to this idol. [Travels in India by Jean Baptise Travernier, pg 58]

হিন্দু পরিবারগুলো মনে নিজের ৮ বছরের মেয়েকে দেবদাসী বানালে স্বর্গে যাবে। পদ্মপুরাণে এসেছে,

আব্বে দুবইস তার বইয়ে দেবদাসী সম্পর্কে লিখেছেন যে, তারা ব্রাহ্মণদের "Enjoyment" ছিলো। "The courtesans or dancing-girls attached to each temples take their place in the second rank; they are called deva dasis (slaves of the gods) but the public call them by the more vulgar name of prostitutes. And in fact they are bound by their profession to grant their favours, if such they be, to anybody demanding them in return for ready money. It appears that at first they were reserved exclusively for the enjoyment of the Brahmins.

And these lewd women, who make a public traffic of their charms, are consecrated in a special manner to the worship of the divinities of India. Every temple of any importance has in its service a band of eight, twelve, or more. Their official duties consist in dancing and singing within the temple twice a day, morning and evening, and also at all public ceremonies" [Hindu Manners and Customs, pg 585]

১৩ শতাব্দীর ভ্রমণকারী ম্যাক্রো পোলোর কাহিনীতে উঠে এসেছে,

Fathers and mothers dedicate their daughters in Temples. Having been so dedicated, they are expected to attend whenever the priests of the convent require them to contribute to the gratification of the idol.... they expect the girls to appear in a state of nudity, with only a cloth round their waists, to chant hymns" [The Travels of Marco Polo, a Venetian, in the Thirteenth Century; Being a Description, by that Early Traveller, of Remarkable Places and Things, in the Eastern Parts of the World, page 647]

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, রাজাদেরও লাভ ছিলো এখানে। আকর্ষণীয় যৌনবস্তু হিসেবে দেবদাসীদের মন্দিরে রাখতে দিতো, তাতে মন্দিরে বেশি বেশি মানুষ যেতো, আর রাজাদের আর্থিক লাভ হতো।

এই দেব দাসীরা যুদ্ধে পরাজিত জাতির বন্দি ছিল না বরং সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের কন্যা সদস্যরা সেচ্ছায় বা দৈব্য আদেশে এই দাসী বৃত্তি গ্রহন করতো। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সমাজে রতী দেবীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলে এই প্রথা পরিবর্তিত হয়। এমনকি কোন

কোন দেশে এই দেব দাসীরা পতিতা বা বেশ্যায় পরিনত হয়েছে, এরকম ইতিহাসও কিছু কিছু আছে।

সমাপ্ত

সুবহানাল্লাহ! ।উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে ইসলাম নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান দেয় বলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) নারীদের সম্মানের ব্যাপারে এতটা গুরুত্বারোপ করেছেন। ইসলাম সুনির্দিষ্ট করেছে নারীর শিক্ষা, নারীর মর্যাদ্ নারীর সুরক্ষা, নারীর নিরাপত্তা এবং নারীর সম্পত্তির অধিকার।একজন কন্যা, একজন স্ত্রী এবং একজন মা হিসেবে ইসলাম নারীকে এমন ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করেছে যে মানমর্যাদার ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্থান শৈল্পীকতার সাজে সুসজ্জিত।

তথ্যসূত্র

https://www.hadithbd.com/

https://www.frommuslims.com/

https://abasar.net/abasarold/abasar/default.htm

https://www.alkawsar.com/bn/

https://www.agniveerbangla.org/

https://www.kalerkantho.com/

https://muslimheritage.com/